

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পটভূমি

বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাল থেকে বন ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ সূচিত হয়, বিশেষত ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ বাংলায় বন বিভাগের সৃষ্টি ও বন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ স্যার ডিয়েট্রিচ ব্রান্ডিস (Dietrich Brandis) কে ভারত সরকারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট নিয়োগ, ১৮৬৫ সালে বন আইন ও ১৮৬৭ সালে ইম্পেরিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস প্রবর্তনের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়। The Forest Act, 1927 প্রবর্তনের মাধ্যমে সংরক্ষিত বন ব্যবস্থাপনার সুদৃঢ় আইনগত ভিত্তি রচিত হয়। সময়ের প্রয়োজনে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বন আইন ও নীতি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে এবং বন ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। শুধুমাত্র বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু হলেও পরবর্তীতে জল বিভাজীকা ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা, জন-মানুষের অধিকতর সম্পৃক্ততা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের নীতি ও কাজে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিশেষতঃ স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বন্যপ্রাণী সংরক্ষন অধ্যাদেশ ১৯৭৩ প্রবর্তনের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সংরক্ষণের (Conservation) ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালেই বন নীতি ১৯৭৯, ১৯৯৪ ও ২০১৬ (খসড়া) সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে অধিকতর জন-বান্ধব হয়। এ সময়েই উপকূলীয় সবুজ বেষ্টিত সৃজন ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। বর্তমানে বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনা, বন জরিপ ও বনভূমির ব্যবহার মনিটরিং কাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। একই সাথে বন অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বন খাতে কার্বন সংরক্ষন কার্যক্রম গ্রহন করেছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বনভূমি ও বনজ সম্পদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা বেড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে বন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ বেড়েছে। বন অধিদপ্তরের এই মুহূর্তে প্রয়োজন শক্তিশালী কাঠামোগত সংস্কার। এ প্রেক্ষাপটে বন অধিদপ্তরের ইতিহাস ও কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হলো:

ইতিহাস

বন বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বার্মায় কর্মরত জার্মান ফরেস্টার Sir Dietrich Brandis-কে ভারত সরকারের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। তিনি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের তৎকালীন সুপারিনটেন্ডেন্ট Dr. Thomas Anderson এর সাথে বাংলার বনাঞ্চলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং Dr. Anderson-কে বনের ওপর প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন। ব্রিটিশ ভারতে বন ব্যবস্থাপনার জন্য ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে Sir Dietrich Brandis-কে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের মহা-বন পরিদর্শক (Inspector General of Forests) পদে নিযুক্ত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ বাংলায় বন বিভাগের সৃষ্টির মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়।

Dr. Anderson পরিচালিত প্রাথমিক জরিপের ওপর ভিত্তি করে ১৮৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভুটান, আসাম, চট্টগ্রাম ও কাছাড় এবং বিহারে চারটি নতুন ফরেস্ট ডিভিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করা হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বন আইন (The Indian Forest Act) পাশ করা হয় এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইম্পেরিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয় (যা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সুপিরিয়র ফরেস্ট সার্ভিস হিসেবে প্রাদেশিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়)। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে Mr. William M. Schlich বাংলার বন সংরক্ষক হিসেবে যোগদানের পর ৫ টি ফরেস্ট ডিভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরেস্ট ডিভিশনসমূহ হলোঃ ১. কুচবিহার ফরেস্ট ডিভিশনঃ কুচবিহারের কমিশনারের অধিক্ষেত্র নিয়ে গঠিত; ২. ঢাকা ফরেস্ট ডিভিশনঃ সিলেট ও কাছাড় নিয়ে গঠিত; ৩. আসাম ফরেস্ট ডিভিশনঃ আসামের কমিশনারের অধিক্ষেত্র নিয়ে গঠিত; ৪. চট্টগ্রাম ফরেস্ট ডিভিশনঃ চট্টগ্রামের কমিশনারের অধিক্ষেত্র নিয়ে গঠিত এবং ৫. ভাগলপুর ফরেস্ট ডিভিশনঃ পশ্চিমের সকল জেলা, পাটনা, ছোট নাগপুর ও ভাগলপুর নিয়ে গঠিত (Millat-e-Mustafa, 2002. A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh)। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ) ও চট্টগ্রাম (পূর্ববঙ্গ) ফরেস্ট ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে ১২০ বর্গমাইল এলাকা সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন যশোর জেলার সুন্দরবনের ৮৮৫ বর্গমাইল এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে এসে বাংলায় ফরেস্ট ডিভিশনের সংখ্যা দুটি

হতে পাঁচটিতে উন্নীত হয় (দার্জিলিং, জলাপাইগুড়ি, পালামৌ, চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবন ফরেস্ট ডিভিশন) এবং সংরক্ষিত বনের পরিমাণ ১২০ বর্গমাইল হতে ১৪৬৭ বর্গমাইলে উন্নীত হয়।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের বন আইন পরিমার্জিত করে বন আইন, ১৯২৭ প্রণয়ন করা হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাউদার্ন এবং নর্দার্ন ফরেস্ট সার্কেল গঠিত হয়। সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ঢাকা-ময়মনসিংহ ফরেস্ট ডিভিশন নিয়ে গঠিত হয় সাউদার্ন ফরেস্ট সার্কেল, যা এখন বাংলাদেশের অংশ। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর সিলভিকালচার ডিভিশন, ওয়ার্কিং প্ল্যান ডিভিশন এবং ইউটাইলাইজেশন ডিভিশন নামে আরও তিনটি ডিভিশন গঠিত হয়, যেগুলো প্রতিষ্ঠার পর হতে সাউদার্ন ফরেস্ট সার্কেল এর অধীন ছিল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সিলভিকালচার ডিভিশন, ওয়ার্কিং প্ল্যান ডিভিশন এবং ইউটাইলাইজেশন ডিভিশন মিলিয়ে আলাদাভাবে ‘ডেভেলপমেন্ট সার্কেল’ গঠিত হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বন বিভাগের (Bengal Forest Department) প্রধান হিসাবে প্রধান বন সংরক্ষক (Chief Conservator of Forests) পদটি সৃজন করা হয়। জনাব T. M. Coffey ছিলেন বাংলার প্রথম চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্টস্ (CCF)।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরে সাউদার্ন ফরেস্ট সার্কেলের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও খুলনা জেলাধীন সুন্দরবন ফরেস্ট ডিভিশন পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আসামের সিলেট ফরেস্ট ডিভিশনও পূর্ব বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতবর্ষের বিভক্তির পর ইম্পেরিয়াল (পরে সুপিরিয়র) ফরেস্ট সার্ভিসের স্থলে ইস্ট পাকিস্তান (প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল) সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয় এবং পরে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক বন বিভাগ (প্রভিন্সিয়াল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট) গঠন করা হয়। তৎকালে একজন বন সংরক্ষক পদমর্যাদার অফিসার পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক বন বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। একইসাথে একজন মহা-বন পরিদর্শক (IGF) উভয় প্রদেশের বন বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব ছিলেন। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক বন বিভাগের অধীনে প্রথমে দুটি এবং পরে তিনটি ফরেস্ট সার্কেল (পূর্ব সার্কেল, পশ্চিম সার্কেল ও উন্নয়ন সার্কেল) গঠিত হয়। চট্টগ্রাম ফরেস্ট ডিভিশন, কক্সবাজার ফরেস্ট ডিভিশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ফরেস্ট ডিভিশন ও সিলেট ফরেস্ট ডিভিশন পূর্ব সার্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয়। সুন্দরবন ফরেস্ট ডিভিশন, ঢাকা ফরেস্ট ডিভিশন ও ময়মনসিংহ ফরেস্ট ডিভিশন পশ্চিম সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ওয়ার্কিং প্ল্যান ডিভিশন এবং ইউটাইলাইজেশন ডিভিশন নিয়ে গঠিত হয় উন্নয়ন সার্কেল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলায় মাঠ পর্যায়ের বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পেশাগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সিলেটে ‘ইস্ট পাকিস্তান (প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল) ফরেস্ট ইনস্টিটিউট’ নামে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় “ইস্ট পাকিস্তান ফরেস্ট স্কুল” এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এর নাম হয় বাংলাদেশ বন বিদ্যালয়, সিলেট। বর্তমানে এটি ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট নামে পরিচিত। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ফরেস্ট রেঞ্জারদের প্রশিক্ষণের জন্য চট্টগ্রামে একটি কলেজ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ফরেস্ট কলেজটি ফরেস্ট একাডেমিতে রূপান্তরিত হয়।

ব্যক্তিগত বনের সংরক্ষণ এবং পতিত ভূমিতে বনায়নের জন্য ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বে প্রণীত The Bengal Private Forests Act, 1945 রহিত করে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে The Private Forests Ordinance, 1959 জারী করা হয়।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর তারিখে বাংলার বন বিভাগের (Bengal Forest Department) প্রধান হিসাবে প্রধান বন সংরক্ষক (Chief Conservator of Forests) পদটি সৃজনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে প্রধান বন সংরক্ষকের পদ সৃজন করা হয়।

বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের ফরেস্ট রিসার্চ ল্যাবরেটরিটি (১৯৫৫ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত)-কে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। যা বর্তমানে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই) নামে পরিচিত।

১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দ হতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম শুরু করা হলেও ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের পর তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় বন বিভাগ

প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে উপকূলীয় বনোৎপাদন বিভাগ, বরিশাল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম পূর্বের ধারাবাহিকতায় চলমান থাকে। যা ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক চর কুকরি-মুকরি পরিদর্শনকালে রাজনৈতিক দৃঢ়তা পায়।

দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান “বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৩” ঘোষনা করেন। পরবর্তীতে উক্ত আদেশকে “বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ)(সংশোধন) আইন, ১৯৭৪” এ রূপান্তর করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ)(সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ কে রহিত করে নতুন “বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২” জারী করা হয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে রক্ষিত বন এলাকার (Protected Areas) সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) পদ্ধতি প্রবর্তন এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। যার ফলে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যও অর্জিত হচ্ছে। দেশের ২২টি টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৮টি জাতীয় উদ্যান, ২৪টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ০২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ০১টি জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, ০৩ টি ইকোপার্ক, ০১টি মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা (Vulture Safe Zone) ঘোষণা করা হয়।

বৃটিশ-ভারতে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত বননীতিকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে পরিমার্জন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন বননীতি প্রণীত হয় (যা ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পরিমার্জন করা হয়)। 'সকলের জন্য বন' এ স্লোগানটিকে ধারণ করে বন বিভাগ কর্তৃক দেশের উপকূলীয় এলাকায় (Coastal belt and Offshore areas) জেগে ওঠা ভূমি, অবক্ষয়িত অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল (Unclassed State Forests) ও সরকারী বনায়নযোগ্য খাস জমিতে বন সম্প্রসারণ এবং বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতীয় বন নীতি, ১৯৭৯ প্রণীত হয়। এ সময়কালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনায় এক বৈপ্লবিক ও গুনগত পরিবর্তন আসে। দেশের যে সমস্ত জেলায় স্বল্প বন এবং বন নেই সে সব জেলায় সামাজিক বনায়ন গুরুত্ব পায় এবং বর্ণিত জেলাসমূহকে সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর, পাবনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া এবং ফরিদপুরে সামাজিক বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যশোর ও বগুড়া সামাজিক বন সার্কেলও প্রতিষ্ঠিত হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন, মরুকরণরোধ ও পরিবেশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮১-৮২ সালে উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর ৭টি জেলা, যথাক্রমে রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা রংপুর, দিনাজপুর, যশোর ও কুষ্টিয়ায় স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশ বন বিভাগ সর্বপ্রথম এদেশে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু করে।

জাতীয় বননীতি, ১৯৭৯ কে সংশোধন ও পরিমার্জন করতঃ জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪ পাশ করা হয়। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণ করাসহ জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত বনভূমি, পতিত ভূমি, অব্যবহৃত কৃষিভূমিসহ অন্যান্য বনায়নযোগ্য ভূমিতে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করা হয়। এছাড়াও প্রকৃতি সংরক্ষণসহ জীববৈচিত্র্যের উন্নয়নে পদক্ষেপ গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, দেশের মোট আয়তনের ২০% ভূমিতে বনায়নের লক্ষ্য সামনে রেখে এ বননীতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালে ২০ বছর মেয়াদি বন মহাপরিকল্পনা (Forestry Master Plan) গৃহীত হয়।

২০০০ সনে বন আইন, ১৯২৭-কে পরিমার্জন ও সংশোধন করে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে বন আইনের আওতায় আনা হয় এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে উক্ত বন আইনের আওতায় সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। যা ২০১০ ও ২০১১ সনে পুনঃসংশোধিত হয়।

১. বাংলাদেশের বন (Forest Types of Bangladesh)

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং বন অধিদপ্তরে রক্ষিত ২০১৮-২০১৯ এর হালনাগাদ তথ্যানুসারে সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৫,৭৫,১৯৬.০১ হেক্টর (গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে), যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৪৫%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৮,৮০,৪৯৩.৭৩ হেক্টর (গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে), যা দেশের আয়তনের প্রায় ১২.৭৪৩%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।



চিত্র: ১: বাংলাদেশের বন



চিত্র: ২ : বাংলাদেশের বন, বান্দারবন

১.১ পাহাড়ী বন (Hill Forests)

চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দারবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ী জেলাসমূহের সরকারি বন এবং পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলসহ পাহাড়ী বনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ী বনভূমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.৫৪%। গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। এছাড়া এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়। এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশুকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই, ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি।



চিত্র: ৩ : পাহাড়ী বন (কাপ্তাই)



চিত্র: ৪: পাহাড়ী বন (টেকনাফ)

১.২ শাল বন (Sal Forests)

কুমিল্লা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় মূলতঃ শাল বন অবস্থিত। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অল্প কিছু শাল বন রয়েছে। এ বনের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনে ০.৮১% এবং মূল প্রজাতি শাল (*Shorea robusta*) যা অনেকেই গজারী বলে জানেন। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়। এ ছাড়া এ বনে হরিতকি, বহেরা, কড়ই, শিমুল, অর্জুন ইত্যাদি প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে। এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে মেছোবাঘ, বনবিড়াল, বানর, শিয়াল, সাপ, পাখি ইত্যাদি।



চিত্র: ৫: শাল বন (মধুপুর)



চিত্র: ৬: শালবন (রংপুর)

১.৩ প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (Natural Mangrove Forests)

খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে আমাদের সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ বন অবস্থিত। এ বনের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.০৭%। সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়া ইত্যাদি এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি। এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, শূকর, কুমির, অজগর ইত্যাদি। বনের মধ্যে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো- পশুর, শিবসা, বলেশ্বর, রায়মংগল ইত্যাদি। তাছাড়া শত শত খাল এ বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। শুধু বৃক্ষসম্পদ নয়, এ বন মৎস্য সম্পদেরও এক বিরাট আধার। ইলিশ, লইচ্যা, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, ভেটকি, পারসে, চিংড়ি, চিত্রা ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অন্তর্গত ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০০ হেক্টর বনাঞ্চলকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে।



১.৪ জলাভূমির বন (Swamp Forests)

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত। রাতারগুল দেশের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন জলাভূমির বন। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় এ বন অবস্থিত। রাতারগুলের আয়তন ২০৪.২৫ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ০.০১%। বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ হলো- হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ ইত্যাদি। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের গাছ পানিতে আংশিক ডুবে থাকে। উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে বানর, মেছোবাঘ, ভৌদড়, কাঠবিড়ালী, সাপ, পাখি ইত্যাদি। মিঠা পানির মাছের আবাসস্থল ও প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান এ বন।



চিত্র: ৯: জলাভূমির বন (সুনামগঞ্জ জেলার হাওড়)

১.৫ সৃজিত উপকূলীয় বন (Coastal Forests)

নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃজন করা হচ্ছে। এ বনকে প্যারা বনও বলা হয়। এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জন-মাল রক্ষা করে। এ বন জেগে ওঠা চরাভূমিকে স্থিতিশীল ও দৃঢ় করে কৃষি কাজসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে। এ বনের আয়তন প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ১.৩৬%। কেওড়া, ছৈলা, বাইন, গেওয়া, গোলপাতা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মতো এ বনও জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়। উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হরিণ, মেছোবাঘ, শিয়াল, বানর, বনবিড়াল, বালিহাঁস ইত্যাদি। এ বন উপকূলীয় মৎস্য ভান্ডারেরও একটি বিরাট উৎস। এখানে ভেটকি, পারসে, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ও কঁকড়া পাওয়া যায়।



চিত্র: ১০: সৃজিত উপকূলীয় বন



চিত্র: ১১: সৃজিত উপকূলীয় বন (চট্টগ্রাম)

২. জেলাভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও বন অধিদপ্তর এর রিমস ইউনিটের কর্মকর্তাদের যৌথ গবেষণায়, ২০১৪ সালের Landsat-স্যাটেলাইট ইমেজ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন বের করা হয়। নিম্নে তার তথ্য উপস্থাপন করা হল:

ছক: ১ জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন

জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন ২০১৪	বৃক্ষ আচ্ছাদন %	জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন ২০১৪	বৃক্ষ আচ্ছাদন %
বাগেরহাট	২১০১.৫৫	৫০.৪৪	লালমনিরহাট	১২১.৯৯	৯.৮৪
বান্দরবান	৩৪০৩.৪৬	৭৩.৬৭	মাদারীপুর	১০৪.৫৪	৯.২৪
বরগুনা	৩০৬.৭৪	১৭.৯২	মাগুরা	১৭৫.৪৮	১৬.৮২
বরিশাল	৫৬৬.১১	২২.০৮	মানিকগঞ্জ	১৪৫.২৬	১০.৪৩
ভোলা	৬৬৩.৬৫	১৭.৫২	মৌলভীবাজার	৯০১.৩৫	৩৩.৩২
বগুড়া	২৬৭.৬০	৯.১৩	মেহেরপুর	৯০.৭৫	১২.৮৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩৪.৭২	৬.৯৪	মুন্সিগঞ্জ	৫০.২১	৫.৩৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৩৯.৮৬	১৪.৩৭	ময়মনসিংহ	৮২০.৬৮	১৮.৯৪
চাঁদপুর	৩৪১.৫১	১৯.৯৩	নওগাঁ	১৫৭.১৫	৪.৫৯
চট্টগ্রাম	১৫৭২.৭৯	২৬.৮৪	নড়াইল	১০৫.৬৯	১০.৬৯
চুয়াডাঙ্গা	১৭৫.০৯	১৫.২৩	নারায়ণগঞ্জ	৪৩.০৯	৬.০৮
কুমিল্লা	৪১৬.৬৪	১৩.৩৬	নরসিংদী	৩৩৬.৬০	২৮.৯৮
কক্সবাজার	৬১৫.৫৭	২০.২৮	নাটোর	২৬২.৯১	১৩.৮১
ঢাকা	১৬৪.৪৩	১১.১৮	নেত্রকোনা	২৫৮.৫৮	৯.২৫
দিনাজপুর	১৫০.২১	৪.৩৫	নীলফামারী	১১১.১২	৬.৯৭
ফরিদপুর	২৫০.২০	১২.৩৩	নোয়াখালী	৫৪১.৮৪	১২.৬৫
ফেনী	২০৬.৯৭	২২.৩৪	পাবনা	২৬৮.৯২	১১.৩২
গাইবান্ধা	১৮১.২৭	৮.৪৪	পঞ্চগড়	৬৪.৬৯	৪.৬৪
গাজীপুর	৬১৫.৮৩	৩৩.৯২	পটুয়াখালী	৪৬৩.০৩	১৩.৩৪
গোপালগঞ্জ	১০৬.৩৬	৭.১৮	পিরোজপুর	৪৫২.৫১	৩৫.৫৩
হবিগঞ্জ	৪২৭.৩২	১৬.৩৭	রাজবাড়ী	১৫৫.৮০	১৩.৬৬
জামালপুর	২১৮.১৯	১০.৬১	রাজশাহী	২৬৩.৫৯	১০.৮৯
যশোর	৫৮৬.৯৯	২২.৯২	রাঙ্গামাটি	৪০১৪.৩৩	৭০.২৬
ঝালকাঠি	২৬৩.৮১	৩৫.৫০	রংপুর	২৮১.৭২	১১.৯৪
ঝিনাইদহ	৩৫৫.৯৬	১৮.২১	সাতক্ষীরা	১৩৩১.৩৮	৩৩.৬১
জয়পুরহাট	৬২.৬৭	৬.৩২	শরীয়তপুর	১৩৭.৯৮	১১.৪৯
খাগড়াছড়ি	১৯৮৬.৭৬	৬৭.৩১	শেরপুর	১৭৯.৯১	১৩.৭২
খুলনা	১৮০৯.৫১	৪০.৯১	সিরাজগঞ্জ	২২১.৬৪	৮.৮৩
কিশোরগঞ্জের	৩১৬.০২	১২.৩২	সুনামগঞ্জ	১৭৩.৯৫	৪.৭৫
কুড়িগ্রাম	২৩৬.২৭	১০.৩২	সিলেট	৬০১.৮৪	১৭.৫২
কুষ্টিয়া	২৫০.৪০	১৫.৩৬	টাঙ্গাইল	৭০৯.৭১	২১.০৩
লক্ষ্মীপুর	৪৩৮.৮০	২৯.২১	ঠাকুরগাঁও	৩০.৪৯	১.৭০

৩. বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বাংলাদেশের বনভূমি ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং জাতীয় বননীতি ও বন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে বন অধিদপ্তরের সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো পূর্ণগঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০০১ সনে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর নতুন ১৪৪৩ টি পদ সৃজন ও ১৪৭টি পদ বিলুপ্ত করে বন অধিদপ্তরের জন্য ৮,৬৮১ সংখ্যক জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হতে ১১১৬ জন রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় বন অধিদপ্তরে বর্তমানে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১০৪৯৭। এর মধ্যে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৬৯৪৪ জন। বর্তমানে অধিদপ্তরে ০৯টি সার্কেল, ৪৭টি বিভাগ, ০৫টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ০১টি বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ০১টি শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার ও ০২টি সাফারী পার্ক বিদ্যমান।

ছক: ২ বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	নিয়োজিত জনবল
১	প্রথম শ্রেণী (গ্রেড ১ থেকে-৯)	৩৪২	১৫৫
২	ফরেস্ট রেঞ্জার (গ্রেড-১০)	৪০৩	৭০
৩	অন্যান্য (গ্রেড-১০)	৪৬	২০
৪	অন্যান্য (গ্রেড-১১-১২)	৬৬	৪০
৫	ডেপুটি রেঞ্জার (গ্রেড-১৪)	৪৫৪	০
৬	ফরেস্টার (গ্রেড-১৫)	১৩৪২	৯৫৫
৭	অন্যান্য (গ্রেড ১৩-১৭)	৩৫৮২	২৪৬৩
৮	অন্যান্য (গ্রেড ১৮-২০)	৪২৬২	৩২৪২
	মোট	১০৪৯৭	৬৯৪৪

সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তনের পর ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও বন অধিদপ্তরের প্রয়োজন বিবেচনায় জনবল বৃদ্ধি করা হয়নি। এ সংকট উত্তোরণের জন্য নূতন অর্গানোগ্রামের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; যার যাচাই বাছাইসহ অন্যান্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। নূতন অর্গানোগ্রামের প্রস্তাবিত পদসমূহ ১৭৩৫০। নূতন অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হলে বাংলাদেশের বনভূমি ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চারিত হবে।

৪. বন অধিদপ্তরের কার্যাবলী

- বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, বন সম্প্রসারণ এবং বনের সীমানা নির্ধারণ।
- বন জরীপ, বন হতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা নির্ধারণ এবং বন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
- সরকারী বনভূমি, পতিত ভূমি, প্রান্তিক ভূমি, অব্যবহারিত কৃষি ভূমি ও নতুন জেগে ওঠা ভূমিতে বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি।
- সামাজিক বনায়ন ও সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন।
- বনের অবক্ষয় রোধের মাধ্যমে বনে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি করে বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে অবদান রাখা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টিনী সৃজন এবং সুন্দরবন সংরক্ষণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা।
- বনজ সম্পদ উৎপাদন এবং বনজসম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

- বনের প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদনে সহায়তা (Assisted Natural Regeneration), অবক্ষয়িত বনের পুনর্বাসন এবং জলবিভাজিকা (Watershed) ব্যবস্থাপনা।
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বনায়নে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান। বনায়ন বিষয়ক কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
- রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ ও সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রকৃতি পর্যটন (Ecotourism) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
- বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়ন।
- বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ, মরুকরণ রোধ, বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্য সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত কনভেনশন, চুক্তি এবং প্রটোকল সমূহের প্রতিশ্রুতি পালনে সহায়তা প্রদান।

বন অধিদপ্তরের অর্জন/সাফল্য

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এছাড়া বন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কতিপয় কার্যক্রম ডিজিটাইজকরণ এ কর্মসূচীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বন এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নসহ বনায়ন কার্যক্রম ও দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

৫. বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

সময়ের পরিক্রমায় এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, কাজের প্রকৃতিতেও যুক্ত হয়েছে বহুমাত্রিকতা। ২০১১ সনে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

অতীতের বন ব্যবস্থাপনা থেকে বর্তমান বন ব্যবস্থাপনা অনেকটাই ভিন্ন। বর্তমান বন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কাঠ উৎপাদনের পাশাপাশি নির্মল বায়ু, পরিচ্ছন্ন পানি, বন্যপ্রাণীর জন্য স্বাস্থ্যকর আবাসস্থল এবং প্রকৃতি-পর্যটন ও জীববৈচিত্র্যের আধার হিসাবে বনকে প্রতিষ্ঠিত করা। বন ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারণা হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা করা, যাতে করে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেন জনসাধারণ বনায়ন কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে এবং ভাবতে পারে যে বনের বৃক্ষ রোপণ ও বড় করার পেছনে তাদেরও অবদান রয়েছে এবং এর মাধ্যমে বনের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বন ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। এখন উৎপাদনশীল বন ব্যবস্থাপনা থেকে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বন ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু নতুন ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন- কৃষি বনায়ন, বসতবাড়ি বনায়ন, রাস্তার ধারে বনায়ন, জবরদখলকৃত জমিতে অংশগ্রহণমূলক বনায়ন, উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চরে ম্যানগ্রোভ বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বনভূমির অবক্ষয় হ্রাসকরণ এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা।

৫.১ বনায়ন কার্যক্রম

সুস্থ্য জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর নির্মল পরিবেশ। ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে এ পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় বনজ সম্পদ ও বনভূমি অপ্রতুল। একটি দেশের প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের মোট ভূখন্ডের অন্ততঃ ২৫% বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশের বিদ্যমান বনভূমির পরিমাণ দেশের আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%।

উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হচ্ছে-৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের অবক্ষয়িত বনভূমিতে উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬ শত হেক্টর ব্লক বাগান সৃজন, প্রান্তিক ভূমিতে ১৫ হাজার কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন, উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৫৩ হাজার ৬শত হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১হাজার ৪ শত গোলপাতা বাগান সৃজনের কার্যক্রম চলমান। ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১৯-২০২০ সাল পর্যন্ত বিগত ২৫ বছরে ম্যানগ্রোভসহ ৩,২০,১৫০ হেক্টর ব্লক বাগান, ৬৩,৮৩০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান এবং জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ১৮কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৬ হাজার চারা বিক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে ইতোমধ্যে জনগণের মধ্যে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে ১ কোটি চারা বিতরণ করা হয়েছে। বেসরকারি নার্সারিতে প্রতি বছর প্রায় ৮.১০ কোটি চারা উত্তোলন করা হয়। এ সমস্ত নার্সারি থেকে উত্তোলিত চারা বেসরকারী সংস্থা এবং সাধারণ জনগণ কর্তৃক নিজ উদ্যোগে সারাদেশে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর কারিগরি সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

৫.১.১ উপকূলীয় বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

উপকূলীয় চরাঞ্চলে বনায়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের অগ্রণী দেশ। বন বিভাগ যাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠা সহ দৃঢ়করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও অভিযোজনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ হাজার ৯৪ বর্গ কি.মি. চর বনায়ন করা হয়েছে। বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬০০ বর্গ কি.মি. আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে। চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের প্রায় ৪৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মাৎস্য প্রজননের ক্ষেত্রে তৈরি করেছে।



৫.১.২ সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন হলো স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রম। ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা ও দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করা ও বৃক্ষাচ্ছাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করাই সামাজিক বনায়নের প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক বনায়নের নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীন, দরিদ্র এবং স্থানীয় জনগণকে সামাজিক বনায়নের অংশীদার করা হয়। তারা সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এছাড়া বাগান সৃজনের পর থেকে ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত তারা সেখানে কৃষি ফসলও উৎপাদন করে থাকে। সামাজিক বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা এবং তাদের খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী ও আসবাবপত্র চাহিদা পূরণ করা। নার্সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ সৃষ্টি, মরুময়তা রোধ, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যতা নিরসনে সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশে বর্তমানে মোট বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২২.৩৭%; যা ২০২৫ সালের মধ্যে ২৪% এ উন্নীত করতে হবে। সামাজিক বনায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ছক: ৩ সামাজিক বনায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি

সামাজিক বনায়ন সময়	সৃজিত বনক/উড লট বাগান (হেক্টর)	সৃজিত স্ট্রীপ বাগান (কিঃ মিঃ)	উপকার ভোগীর সংখ্যা (জন)		কর্তিত বনক/উড লট বাগান (হেক্টর)	কর্তিত স্ট্রীপ বাগান (কিঃ মিঃ)	মোট বিক্রয় মূল্য	উপকার ভোগীর লভ্যাংশ	লভ্যাংশ বিতরণ কারী উপকার ভোগীর সংখ্যা	ট্রি ফার্মিং ফান্ড (টি এফ এফ)	রাজস্ব আয়	ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং অগ্যান্য সংস্থার লভ্যাংশ
			পুরুষ	মহিলা								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩১ইই ২৭-১৭৭১	৭৮.০২-৬১০০	৭৪৭৬৫.৩৩	৭২২৪৬৫	১৩৭৩৩২	১২৬৬৮	২৬৬১২	০.৭৭৭.৭৩.৩১.৩৩৩৩	০.৩৬৬.৪৪.৭৬.১১১১	৩৬০৫০২	০.৭২২.৩৭.৪৬.১১১১	০.৪৪৪.৬২.৩৪.৩৪	০.২১৪.৬৩.৭৭.১২



চিত্র: ১৩: সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম, রাজশাহী

৫.১.৩ বনায়ন কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন

সামাজিক বনায়নের আওতায় নার্সারিতে চারা উত্তোলন, বাগান সৃজন ও পরিচর্যা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ অনুযায়ী ৩০% দুঃস্থ নারী উপকারভোগী হওয়ায় সুযোগ পেয়ে থাকেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ দুইজন নারী থাকেন। সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪



চিত্র: ১৪: বনায়ন কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন

চিত্র: ১৫: বনায়ন কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন

এর বিধি ৭ এর (১) উপবিধিতে চুক্তির আওতায় উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা এর ক্ষেত্রে স্ত্রী ও স্বামীকে সমান অধিকার অর্পণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০% নারীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস্ ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ ও নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পর্যায়ে এবং দাপ্তরিক পদমর্যাদায় নারীর অবস্থানকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

৫.১.৪ বনজদ্রব্য বিক্রয় এবং বিক্রিত বনজদ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ

Forest Manual Part-II এর Article 31 এর আলোকে বনজদ্রব্য বিক্রয় করা হয় এবং বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০১১ এর আলোকে পার্বত্য জেলা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ এবং The Chittagong Hill Tracts' Forests Transit Rules, 1973 ও Sundarbans Transit Rules এর আলোকে যথাক্রমে দেশের পাবর্ত্য তিন জেলায় ও সুন্দরবনে বনজদ্রব্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৫.১.৫ ব্যক্তি মালিকানাধীন বনজ সম্পদ আহরণের অনুমতি প্রদান

বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ এর অনুবলে সারাদেশে এবং পাবর্ত্য জেলায় বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা (The Chittagong Hill Tracts' Forests Transit Rules, 1973) অনুসরণ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি হতে বনজ সম্পদ আহরণের জন্য পারমিট প্রদান করা হয়।

৫.১.৬ বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মহাল ইজারা প্রদান

বন অধিদপ্তরের কোন বিশেষ এলাকায় যেমন সিলেট বন বিভাগে বাঁশ মহাল, ছন মহাল, জলমহাল সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বিভিন্ন মহালদারদের নিকট ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং এতে সরকারে প্রচুর রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

৫.১.৭ বন অধিদপ্তরের কার্যসম্পাদনের জন্য বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা

আইন

১. বন আইন, ১৯২৭ (২০০০ সনে সংশোধিত)।
২. The Private Forests Ordinance, 1959
৩. The Attia Forest (Protection) Ordinance, 1982
৪. বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২।

বিধিমালা

১. The Chittagong Hill Tracts' Forests Transit Rules, 1973.
২. Sundarbans Transit Rules 1959
৩. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (২০১০ ও ২০১১ সনে সংশোধিত)।
৪. বনজঙ্গল পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১।
৫. করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২।
৬. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭।
৭. হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৭।
৮. কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯।
৯. বন অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯।
১০. পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০।
১১. অপরাধ উদঘাটনে তথ্য প্রদানকারীকে পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০।

নীতিমালা

১. জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪।
২. বৃক্ষরোপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা, ২০০৪ (২০১৩ সনে সংশোধিত)।
৩. বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০।
৪. বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১১।
৫. আগর বৃক্ষ বিক্রয় নীতিমালা, ২০১২।
৬. সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা, ২০১৪।

৫.১.৮ বনভূমি

বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির তথ্যাদি সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ সালে হালনাগাদ করা হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি বিবেচনায় হালনাগাদকৃত বনভূমির তথ্যাদি এরূপঃ ১। সংরক্ষিত বন- ৩৩,১০,৯০৭.৫২ একর (১৩,৩৯,৯০৫.৯২ হেক্টর), ২। ৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত বন-১১,৭২,৯৭১.৭৫ একর (৪,৭৪,৬৯৫.১৬ হেক্টর), ৩। রক্ষিত বন- ৯১,৩৮১.৮৯ একর (৩৬,৯৮১.৭৪ হেক্টর), ৪। অর্জিত ও অর্পিত বন- ২৮,৫৯১.৩৪ একর (১১,৫৭০.৭৬ হেক্টর), ৫। অশ্রেণীভুক্ত বন- ৪২,৮৪৭.৫১ একর (১৭,৩৪০.১৫ হেক্টর)। অর্থাৎ বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট বন ভূমির পরিমাণ- ৪৬,৪৬,৭০০.০১ একর (১৮,৮০,৪৯৩.৭৩ হেক্টর), যা দেশের আয়তনের ১২.৭৪৩% (প্রায়)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ যাবৎ মোট ১,৬০,০৩২.৭৭৪৫ একর (৬৪,৭৯০.৫৯৭ হেক্টর) বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমি বিভিন্ন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (বন অধিদপ্তরে সংরক্ষিত ২০১৮-২০১৯ সালের হালনাগাদকৃত তথ্যানুসারে)।

৬. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals)

২০১৫ সালে জাতিসংঘ দারিদ্র্য, বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের অবক্ষয়, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং ন্যায়বিচারে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ১৭টি আন্তঃসংযুক্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) গ্রহণ করেছে; যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে SDG 15: Life on Land, যার ১২ টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৪টি ইন্ডিকেটর এর বিপরীতে তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে থাকে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)-তে দেশের মোট ভূমির ১৬% বনাচ্ছাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান, আবাদী জমি, কাঠ ও জ্বালানী কাঠের চাহিদা পূরণ এবং নগরায়ন ও শিল্পায়নের অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত বিস্তৃতির প্রভাবে বিদ্যমান বনাঞ্চলের অস্তিত্বও আজ হুমকিগ্রস্ত।

৭. বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। আইইউসিএন এর ২০১৫ সালের জরীপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ১১৬৩ প্রজাতির মেরুদণ্ডী বন্যপ্রাণী রয়েছে; তার মধ্যে ৪৯টি উভচর, ১৬৭ টি সরীসৃপ, ৫৬৬টি পাখি ও

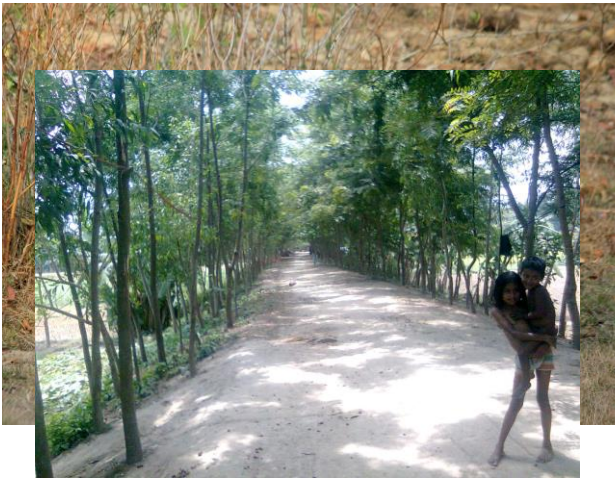
১৩৮টি স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ২৫৩ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ রয়েছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে ১৪১টি ক্রাস্টাসিয়ান ও ৩০৫টি প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীসহ সর্বমোট ১৬১৯টি প্রজাতি রয়েছে।

বাংলাদেশের বন, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিপুল জীববৈচিত্র্যের সমাহার, রয়েছে কতিপয় বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব। উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে ৪৭০ প্রজাতির ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া, ১৯৮৮ প্রজাতির শৈবাল, ২৭৫ প্রজাতির ফানজাই, ২৪৮ মস জাতীয় উদ্ভিদ, ১৯৫ প্রজাতির ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ, ৭ প্রজাতির নগ্নবীজি এবং ৩ হাজার ৬১১ প্রজাতির গুল্মবীজি (২৬৩৩ প্রজাতির দ্বি-বীজপত্রী এবং ৯৮৮ প্রজাতির একবীজপত্রী) উদ্ভিদ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে দেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে আরো বেগবান করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিভিন্ন প্রটোকল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে; যেমন: বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কনভেনশন (CBD), পরিযায়ী প্রজাতির সংরক্ষণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CMS), মহাবিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আন্তর্জাতিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CITES) ইত্যাদি।

১৯৭৩ সনে বন বিভাগের অধীন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বন্যপ্রাণী সার্কেল সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সনে বন্যপ্রাণী সার্কেল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলেও ১৯৯৩ সালে গৃহীত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণী সার্কেল পুনরায় সৃষ্টি করা হয়।

২০০১ সালে বন অধিদপ্তরের অধীনে বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল নামে একটি স্থায়ী সার্কেল সৃষ্টি করা হয়। এ অঞ্চলের আওতায় উদ্ভিদ উদ্যান, জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য ও সাফারী পার্ক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সে লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা এলাকার জন্য বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে “স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন” প্রকল্পের আওতায়- গাজীপুরে “শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার”; ঢাকায় “বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট”; হবিগঞ্জ, শেরপুর ও রাজশাহীতে নতুন ৩টি “বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ” সৃষ্টি করা হয়।



কার্যক্রম সাফারী পার্ক



৯.১ প্রজাতি ভিত্তিক সংরক্ষণ কার্যক্রমঃ

৮.১.১ Bengal Tiger বা বাঘ (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ

- বাঘ সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর শিকার বন্ধের জন্য অধিকতর শাস্তির বিধান রেখে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ নামে একটি আইন কার্যকর হয়েছে।
- বাঘ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১১ সালে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ২০১৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ১৪-১৬ তারিখ বাংলাদেশ সরকার ২য় স্টকটেকিং সম্মেলন আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
- বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী শিকার ও পাচার রোধে বাংলাদেশ সরকার গত ২৬-২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় SAWEN (South Asian Wildlife Enforcement Network) 3rd Annual Meeting এর আয়োজন করে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাঘ রক্ষায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যারামান উদ্বোধন করেন।
- ২০১৪ সালে বন অধিদপ্তর সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ শুমারী পরিচালনা করেছে। এ জরিপে সুন্দরবনে ১০৬টি বাঘ পাওয়া গিয়েছে।
- ২০১৮ সালে পুনরায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ শুমারী পরিচালনা করা হয়েছে এবং সুন্দরবনে ১১৪ টি বাঘ পাওয়া গিয়েছে।
- সুন্দরবনের বাঘ রক্ষার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে Tiger Coordination Committee গঠন করা হয়েছে।
- বাঘের আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য “বন্যপ্রাণীর আক্রমণে জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা-২০১০” প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই নীতির আলোকে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ১ লক্ষ ও আহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ হাজার করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে।
- বাঘ সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশ টাইগার এ্যাকশন প্ল্যান ২০১৮-২০২৭ প্রণয়ন করেছে।
- সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবনের চারটি রেঞ্জে নিয়মিত স্মার্ট প্যাট্রোলিং কার্যক্রম চলছে।
- মানুষ-বাঘ দ্বন্দ্ব নিরসনে সুন্দরবনের আশেপাশের গ্রামে ৪৯ টি ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে।
- বাঘ এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ ও বংশবিস্তারের লক্ষ্যে সুন্দরবনের ৫২% এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এর কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- সুন্দরবনে বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব নির্ধারণের কাজ প্রতি দুই বছর পর পর করা হয়ে থাকে।
- এছাড়া বাঘ সংরক্ষণে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



চিত্র: ১৮: Bengal Tiger বা বাঘ (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন)

৮.১.২ Asian Elephant বা হাতি (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ

- ২০১৬ সালে বন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত জরিপে ২৬৮ টি বন্য হাতি পাওয়া গিয়েছে।

- Bangladesh Elephant Conservation Action Plan (2018-2027) প্রণয়ন এবং দেশের অভ্যন্তরে হাতি চলাচলের পথ ও করিডোর বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত এবং ট্রান্সবায়ন্ডারি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে।
- শেরপুর- জামালপুরের সীমান্তবর্তী হাতি উপদ্রুত এলাকায় Bio-Fencing ও সৌরশক্তি চালিত বৈদ্যুতিক বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রাজামাটির কাপ্তাই এ সোলার ফেন্সিং স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- হাতি উপদ্রুত এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনে এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করা হয়।
- ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে Transboundary হাতি সংরক্ষণে বাংলাদেশ ও ভারত তৃতীয় সংলাপ ঢাকায় আয়োজন করা হয়েছে। হাতি সংরক্ষণ বিষয়ে Protocol on Transboundary Elephant Conservation Between the Peoples' Republic of Bangladesh and The Peoples' Republic of India ডিসেম্বর, ২০২০ এ স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- সম্প্রতি হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও করিডোরের মাধ্যমে বন্য হাতির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Cox's Bazar with Myanmar and India” শীর্ষক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
হাতির আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য “বন্যপ্রাণীর আক্রমণে জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা-২০১০” প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই নীতির আলোকে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ১ লক্ষ ও আহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ হাজার করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে।



চিত্র: ১৯: Asian Elephant বা হাতি (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ

৮.১.৩ শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন (Vulnerable বা সংকটাপন্ন) সংরক্ষণঃ

- বাংলাদেশে বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনে ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি অভয়ারণ্য সহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে।
- ডলফিনের গবেষণার ঘাটতি বিশ্লেষণ এবং আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ডলফিন এ্যাকশন প্ল্যান এবং দেশের অভ্যন্তরে ডলফিনের বিস্তৃতি বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।
- হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সুন্দরবনের তিনটি ডলফিন অভয়ারণ্যের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পৌচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর অথাৎ ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ট্রাফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ৩৭ এ তিমি বা ডলফিন হত্যার জন্য শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে।

- সুন্দরবনের ডলফিন সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সুন্দরবনের ডলফিন অভয়ারণের সংলগ্ন মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এছাড়াও ডলফিন মেলা আয়োজন সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ডলফিন সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম সমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনে ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (ঢাংমারী, দুধমুখী ও চাঁদপাই) তে এ বৃদ্ধির হার ৫৫%, যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।



চিত্র: ২০: শূশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন
(Vulnerable বা সংকটাপন্ন) সংরক্ষণঃ সংরক্ষণঃ



চিত্র: ২১: শূশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন
(Vulnerable বা সংকটাপন্ন) সংরক্ষণঃ সংরক্ষণঃ

৮.১.৪ লোনা পানির কুমির (Endangered বা বিপন্ন) সংরক্ষণঃ

- বন অধিদপ্তর সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত (১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত; ৮.০ একর) বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে কুমির এর কনজারভেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে সুন্দরবনে কুমির এর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছে। এই প্রজনন কেন্দ্রে লোনা পানির কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন, লালন-পালন ও পরবর্তীতে প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- পুকুরের পাড় হতে ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম ফুটিয়ে তা হতে বাচ্চার জন্ম দেয়া হয়। বাচ্চা লালন পালন করার জন্য এখানে পেন রয়েছে। বিভিন্ন বয়সী কুমিরের জন্য আলাদা আলাদা পেন রয়েছে। কুমিরের বয়স যখন পাঁচ বছর হয় (কিংবা দৈর্ঘ্য ১.০ মিটার বা ততোধিক) তখন এগুলো সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার নদীতে অবমুক্ত করা হয়।
- বর্তমানে বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে ১৯৫ টি কুমির রয়েছে যার মধ্যে ৪টি বড় পুরুষ এবং ২টি বড় স্ত্রী কুমির রয়েছে। আর বাকিগুলো বাচ্চা কুমির। ১০৫টি কুমির অদ্যাবধি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।



চিত্র:২২: লোনা পানির কুমির (Endangered বা বিপন্ন) সংরক্ষণঃ



চিত্র: ২৪: লোনা পানির কুমির (Endangered বা বিপন্ন) সংরক্ষণঃ



চিত্র: ২৩: লোনা পানির কুমির (Endangered বা বিপন্ন) সংরক্ষণঃ

৮.১.৫ বড় কাইট্টা কাছিম (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ

মহাবিপন্ন বড় কাইট্টা কাছিম সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা চিড়িয়াখানা এবং Turtle Survival Alliance (TSA) এর যৌথ উদ্যোগে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর ও করমজল, সুন্দরবনে ২ টি Conservation Breeding Center স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ৩৬৭ টি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে যা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হবে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমেও এদের সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.১.৬ বাংলা শকুন (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ

- ২০১০ সালে দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ ‘ডাইক্লোফেনাক’ নিষিদ্ধকরণ।
- ২০১৩ সালে ‘বাংলাদেশ জাতীয় শকুন সংরক্ষণ কমিটি’ (বিএনভিআরসি) গঠন।
- ২০১৪ সালে দেশের দু’টি অঞ্চলকে শকুনের জন্য নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা। এলাকা দু’টি হচ্ছে- শকুনের নিরাপদ এলাকা-১ (সিলেট বিভাগ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু অংশ) এবং নিরাপদ এলাকা-২ (খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের কিছু অংশ)। এ দুটি এলাকার মোট আয়তন ৪৭,৩৮০.৪৪ বর্গ কিলোমিটার।
- ২০১৫ সালে শকুনের প্রজননকালীন সময়ে বাড়তি খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য হবিগঞ্জের রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে ও সুন্দরবনে দু’টি ফিডিং স্টেশন স্থাপন। উল্লেখ্য, রেমা-কালেঙ্গায় ২০১৪ সালে শকুনের প্রজনন সফলতা ছিল ৪৪ শতাংশ, সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- ২০১৬ সালে দশ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০২৫) বাংলাদেশ শকুন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ২০১৬ সালে অসুস্থ ও আহত শকুনদের উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিনাজপুরের সিংড়ায় একটি শকুন উদ্ধার ও পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৯৩টি হিমালয়ান গৃধিণি প্রজাতির শকুন উদ্ধার, পরিচর্যা শেষে পুনরায় প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।
- ২০১৭ সালে শকুনের জন্য নিরাপদ ২টি এলাকায় কিটোপ্রোফেনের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা।



চিত্র: ২৫: বাংলা শকুন (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ



চিত্র: ২৬: হিমালয়ী গ্রিষিনি শকুন (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ

৮.১.৭ এশিয়া শিলা কচ্ছপ (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ

- মহাবিপন্ন এশিয়া শিলা কচ্ছপ এবং হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এবং Creative Conservation Alliance এর যৌথ উদ্যোগে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর ১টি Turtle Conservation Breeding Center স্থাপন করা হয়েছে।
- উক্ত Breeding Centre এ ২০১৯ এবং ২০২০ সালে Captive Breeding এর মাধ্যমে এশিয়া শিলা কচ্ছপ এর ২৭টি বাচ্চা পাওয়া গেছে এবং জীবিত আছে।
- চলতি নভেম্বর/২০২০ মাসে Captive Breeding এর মাধ্যমে হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ ০৯টি ডিম পেড়েছে।
- Captive Breeding এর মাধ্যমে জন্ম নেয়া এশিয়া শিলা কচ্ছপ ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ এর বাচ্চাগুলোকে পরবর্তীতে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হবে।
- এছাড়া বিলুপ্তপ্রায় কাছিম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।



চিত্র: ২৭: এশিয়া শিলা কচ্ছপ (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ



চিত্র: ২৮: হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ

৮.১.৮ বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণঃ

- পরিযায়ী পাখি সহ উপকূলীয় এলাকার পাখি সংরক্ষণে বাংলাদেশের ৬টি এলাকাকে East Asian-Australasian Flyway Site ঘোষণা করা হয়েছে।

- এলাকাগুলো হলো- সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, এবং গাঙগুইয়ার চর।
- এছাড়া বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং আইইউসিএন এর যৌথ উদ্যোগে দেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট টাংগুয়ার হাওরে পাখি শুমারি ও পাখির গায়ে রিং পড়ানো এবং জিপিএস স্যাটেলাইট ট্যাগ করা হয়েছে।
- অবৈধভাবে পাখি শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।



চিত্র:২৯: বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ (সোনাদিয়া)



চিত্র: ৩০: বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ (টাংগুয়ার হাওর)

৮.১.৯ বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় হাওর ও রে মাছের প্রজাতি সংরক্ষণঃ

- বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং Nature Conservation Society (NCS) এর যৌথ উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে হাওর ও রে প্রজাতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও অবৈধ ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিউর প্রকাশ।
- নিষিদ্ধ হাওর ও রে মাছ ধরা ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৮.১.১০ উল্লুক (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণঃ

- সমগ্র দেশে বিলুপ্তপ্রায় উল্লুকের সংখ্যা প্রায় ৩৫০টি।
- মূলত দেশের সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়।
- বিলুপ্তপ্রায় উল্লুক সংরক্ষণের জন্য মৌলভীবাজার জেলায় লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ইতোমধ্যে বন্যপ্রাণীর খাবার উপযোগী গাছের বনায়ন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বন্য পশুপাখির খাবার উপযোগী বনায়ন সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বৃক্ষচারী এই প্রজাতিটিকে সংরক্ষণে তাদের চলাচলের জন্য সাতছড়ি ও লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে Canopy Walkway / Bridge তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।



চিত্র: ৩১ উল্লুক (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন)
সংরক্ষণ (লাওয়াছড়া)



চিত্র: ৩২ উল্লুক (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন)
সংরক্ষণ (সাতছড়ি)

৮.১.১১ অন্যান্য সংরক্ষণ কার্যক্রমঃ

- জাতীয়ভাবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার “বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন” প্রবর্তন করেছে। প্রতিবছর তিনটি ক্যাটাগরিতে পদক, সনদ ও সম্মানী প্রদান করা হয়।
- দেশের বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় ও বিদ্যমান বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক ৪৯ টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত রক্ষিত এলাকাসমূহে বন্যপ্রাণী শিকার, হত্যা, ধরা বন্ধ করা সহ তাদের অবাধ বিচরণ ও প্রজননের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিরল, বিপদাপন্ন, বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ও কক্সবাজার এলাকায় “Transboundary Wildlife Corridor with Myanmar and India” শীর্ষক সম্ভাবতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২২টি রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি দেশব্যাপি নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সুন্দরবনে কর্মরত মাঠপর্যায়ের বনকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাড় জলোচ্ছাস, লোনাপানি, জলদস্যু, বনদস্যুর সাথে সংগ্রাম করে সুন্দরবন ও সুন্দরবনের বাঘ রক্ষা করে যাচ্ছে। তাদের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে সরকার ৩০% ঝুঁকিভাতা প্রদান করছে।
- উল্লেখ্য বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির লাল তালিকা প্রনয়ণের কাজ বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের মাধ্যমে সম্প্রতি শুরু করা হয়েছে।

৮.২ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ

বন্যপ্রাণী পাচার রোধ এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আলোকে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের অধীনে Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection (SRCWP) প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (Wildlife Crime Control Unit) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য হলো অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার, পাচার, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় জনিত অপরাধ

নিয়ন্ত্রণ করা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে (বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এ বর্ণিত শাস্তির বিধান প্রয়োগ ও তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রিকালে এ পর্যন্ত (জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২০) মোট ৩১,১৯৭ টি বন্যপ্রাণী (তন্মধ্যে ২৪৭টি স্তন্যপায়ী, ২২৮৮৪টি পাখি, ৮০৬৬টি সরীসৃপ) উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে ১৭৪টি ট্রফি এবং ৩৩২টি মামলা দায়ের সহ ২০০ জন অপরাধীকে ধৃত করা হয়েছে।



চিত্র: ৩৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে উদ্ধারকৃত ছয় শতাধিক পাখি



চিত্র: ৩৪ গ্রীনভিউ রিসোর্ট, মৈনারটেক, উত্তরখান, ঢাকা থেকে উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর ট্রফি

৯. রক্ষিত এলাকা (Protected Area)

“রক্ষিত এলাকা” অর্থ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩, ১৭, ১৮ ও ১৯ অনুসারে সরকার ঘোষিত সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান ও ধারা ২২ অনুসারে গঠিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ধারা ২৩ অনুসারে গঠিত জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন।

দেশে বর্তমানে রক্ষিত এলাকার (Terrestrial & Marine) সংখ্যা ৪৯ টি, যার মোট পরিমাণ ৬,৩৭,৮৭৪.৬১ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের ৪.৩২২ শতাংশ। রক্ষিত এলাকাগুলোর তালিকা নিম্নের টেবিলে দেখানো হয়েছে।

৯.১ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

ছক: ৪ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

ক্র নং	বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ
১	রেমা কালেক্জা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১৭৯৫.৫৪	০৭/০৭/১৯৯৬
২	চর কুকরি মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	ভোলা	৪০.০০	১৯/১২/১৯৮১
৩	সুন্দরবন ইষ্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১২২৯২০.৯০	২৯/০৬/২০১৭
৪	সুন্দরবন ওয়েস্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	সাতক্ষীরা	১১৯৭১৮.৮৮	২৯/০৬/২০১৭
৫	সুন্দরবন সাউথ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	৭৫৩১০.৩০	২৯/০৬/২০১৭
৬	পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪২০৬৯.৩৭	২০/০৯/১৯৮৩
৭	চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৭৭৬৩.৯৭	১৮/০৩/১৯৮৬
৮	ফাসিয়াখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১৩০২.৪২	১১/০৪/২০০৭
৯	দুধপুকুরিয়া-ধোপাছরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৪৭১৬.৫৭	০৬/০৪/২০১০
১০	হাজারিখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	১১৭৭.৫৩	০৬/০৪/২০১০

১১	সাজু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বান্দরবন	২৩৩১.৯৮	০৬/০৪/২০১০
১২	টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১১৬১৪.৫৭	০৯/১২/২০০৯
১৩	টোংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বরগুনা	৪০৪৮.৫৮	২৪/১০/২০১০
১৪	দুধমুখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১৭০	২৯/০১/২০১২
১৫	চান্দপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৫৬০	২৯/০১/২০১২
১৬	টাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৩৪০	২৯/০১/২০১২
১৭	সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পটুয়াখালী	২০২৬.৪৮	২৪/১২/২০১১
১৮	নাজিরগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য	পাবনা	১৪৬	০১/১২/২০১৩
১৯	শিলন্দা নাগডেমড়া ডলফিন অভয়ারণ্য	পাবনা	২৪.১৭	০১/১২/২০১৩
২০	নগরবাড়ি-মোহনগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য	পাবনা	৪০৮.১১	০১/১২/২০১৩
২১	পানখালী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য	খুলনা	৪০৪.০০	০৪/০৩/২০২০
২২	শিবসা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য	খুলনা	২১৫৫.০০	০৪/০৩/২০২০
২৩	ভদ্রা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য	খুলনা	৮৬৮.০০	০৪/০৩/২০২০
২৪	পদ্মা সেতু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	মাদারীপুর, শরিয়তপুর, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর	১১৭৭২.৬০৫	২৬/১১/২০২০



চিত্র: ৩৫ চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য



চিত্র: ৩৬ চর কুকরি মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

৯.২ জাতীয় উদ্যান

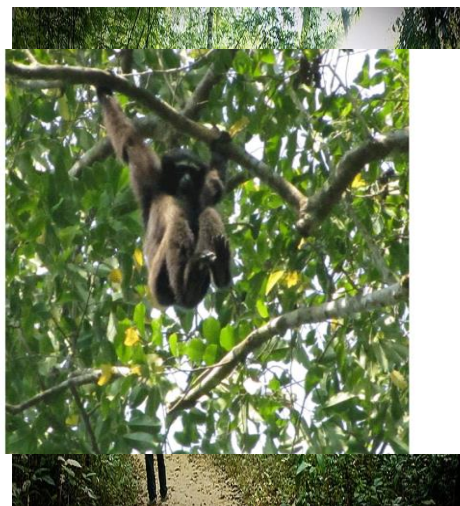
ছক: ৫ জাতীয় উদ্যান

ক্র নং	জাতীয় উদ্যান	অবস্থান	আয়তন (হেক্ট)	প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ
১	ভাউয়াল জাতীয় উদ্যান	গাজীপুর	৫০২২.২৯	১১/০৫/১৯৮২
২	মধুপুর জাতীয় উদ্যান	টাংগাইল এবং ময়মনসিংহ	৮৪৩৬.১৩	২৪/০২/১৯৮২
৩	রামসাগর জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	২৭.৭৫	৩০/০৪/২০০১
৪	হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	১৭২৯	১৫/০২/১৯৮০
৫	লাওয়াছরা জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	১২৫০	০৭/০৭/১৯৯৬
৬	কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫৪৬৪.৭৮	০৯/০৯/১৯৯৯

৭	নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান	নোয়াখালী	১৬৩৫২.২৩	০৮/০৪/২০০১
৮	মেধাকছপিয়া জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৩৯৫.৯২	০৪/০৪/২০০৪
৯	সাতছরি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	২৪২.৯১	১০/১০/২০০৫
১০	খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	সিলেট	৬৭৮.৮০	১৩/০৪/২০০৬
১১	বারইয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	চট্টগ্রাম	২৯৩৩.৬১	০৬/০৪/২০১০
১২	কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	পটুয়াখালী	১৬১৩	২৪/১০/২০১০
১৩	নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৫১৭.৬১	২৪/১০/২০১০
১৪	সিংড়া জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৩০৫.৬৯	২৪/১০/২০১০
১৫	কাদিগর জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ	৩৪৪.১৩	২৪/১০/২০১০
১৬	আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান	নওগাঁ	২৬৪.১২	১৪/১২/২০১১
১৭	বিরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	১৬৮.৫৬	১৪/১২/২০১১
১৮	শেখ জামাল ইনানী জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৭০৮৫.১৬	১৫/০৪/২০১৯



চিত্র: ৩৭ সাতছরি জাতীয় উদ্যান



চিত্র: ৩৮ লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান

৯.৩ উদ্ভিদ উদ্যান

ছক:৬ উদ্ভিদ উদ্যান

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ
-----	---------	----------------	-----------------------

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান	ঢাকা	৮৪.২১	২৭/০৮/২০১৮
বলধা গার্ডেন	ঢাকা	১.৩৭	-



চিত্র: ৩৯ জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান



চিত্র: ৪০ জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান

৯.৪ বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

ছক:৭ বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেক্ট)	প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ
বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা (রাতারগুল)	সিলেট	২০৪.২৫	৩১/০৫/২০১৫
আলতাদীঘি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা	নওগাঁ	১৭.৩৪	০৯/০৬/২০১৬



চিত্র:৪১ আলতাদীঘি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা



চিত্র:৪২ বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা (রাতারগুল)

৯.৫ ইকোপার্ক

ছক:৮ ইকোপার্ক

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেক্ট)	প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ
মাধবকুন্ড ইকো পার্ক	মৌলভীবাজার	২৬৫.৬৮	০২/০৫/২০১৯
টিলাগড় ইকোপার্ক	সিলেট	৪৫.৩৪	০৮/০১/২০১৯

চর মুগুরিয়া ইকোপার্ক	মাদারিপুর	৪.২০	২৫/০৮/২০১৫
-----------------------	-----------	------	------------



চিত্র:৪৩ মাধবকুন্ড ইকো পার্ক



চিত্র:৪৪ মাধবকুন্ড ইকো পার্ক

৯.৬ মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া (Marine Protected Area)

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া

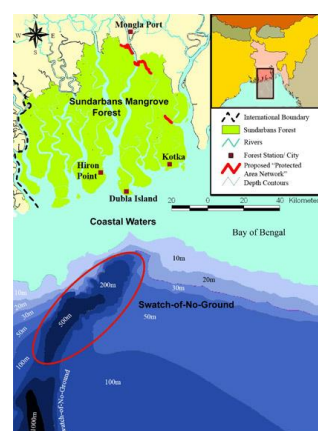
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এর ধারা ১৩ (১) এবং ১৩ (২) এর ক্ষমতা বলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রজ্ঞাপন মূলে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এর ১৭৩৮.০০ বর্গ কিলোমিটার অংশকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন (ইরাবতী ডলফিন, গোলাপি ডলফিন, বোতলনাক ডলফিন, চিত্রা ডলফিন, ঘূর্ণি ডলফিন) পাখনাহীন শূশুক, কয়েক প্রজাতির তিমি (ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি ইত্যাদি) এবং হাঙ্গর (হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, থুটি হাঙ্গর, ফৌরি হাঙ্গর, করাতি হাঙ্গর ইত্যাদি) এর সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে “সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া” হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর গড় গভীরতা ৯০০ মিটারের বেশি।

ছক:৮ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ
সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া	দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর	১৭৩৮০০	২৭/১০/২০১৪



চিত্র: ৪৫ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া



চিত্র: ৪৬ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড

৯.৭ রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৩১) অনুসারে “সহ-ব্যবস্থাপনা” অর্থ কোনো একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বুঝায়। বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ও খাদ্যের উৎস এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা, বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আবাসস্থল এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবেও রক্ষিত এলাকার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ, অবৈধভাবে গাছকর্তন, বন বিভাগের পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, গবাদি পশুর বিচরণ, বনে আগুন এবং সর্বোপরি বনভূমি কৃষি ও জনবসতিতে পরিনত হওয়ায় বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসমূহ হুমকির সম্মুখীন।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘকালের চলে আসা প্রথাগত পদ্ধতির নানা দুর্বলতা দূর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (বিশেষতঃ উন্নয়নশীল বিশ্বে) প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আশার সঞ্চার করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এ পদ্ধতি আদর্শ একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ ও ইউএসআইডি যৌথ উদ্যোগে নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (২০০৪-২০০৮) সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বা আইপ্যাক প্রকল্প (২০০৮-২০১৩) এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকা বা ফ্রেল প্রকল্প (২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুসহ ২৮ টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রকল্প নির্ভরতা, এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দুর্বলতার কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এখনও আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ অনুমোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করেছে, যার সফল বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন হবে।



চিত্র: ৪৭ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা সচেতনতা কার্যক্রম খুলনা



চিত্র: ৪৮ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা সচেতনতা কার্যক্রম খুলনা

১০. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহঃ

সারাদেশ ব্যাপী বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৭২-১৯৭৩ হতে ২০১৯-২০২০ সময়কালে ১৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্প, ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১৫-২০১৬ সময়কালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৮টি কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০১০-২০১১ সাল হতে অদ্যাবধি ৩৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

১০.১ বন

ছক:৯ বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম ও বাসত্ববায়নকাল	প্রকল্প এলাকা ও অর্থায়নের উৎস		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা। জিওবি	(জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	১৬৩৪.৬০
২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর জিওবি	(জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৩৯০৪.০০
৩	বৃহত্তর রংপুর জেলার সামাজিক বনায়নের টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা জেলা জিওবি	(জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	২২৭৯.০৮
৪	বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প	সমগ্র বাংলাদেশ জিওবি	(জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২)	৩১৭১.২৩
৫	শেখ রাসেল এ্যাভিনিউর এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাজশুনীয়া, চট্টগ্রাম	রাজশুনীয়া, চট্টগ্রাম জিওবি	(জুলাই ২০১৭ হতে ২০২১)	১২৫৫১.২৪
৬	বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন	পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জিওবি	(জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১০৪৮০.২৬
৭	স্থানীয় নৃগোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেশসই ব্যবস্থাপনা		(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	১৭১৭.২০
৮	প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্লউড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্লউড বাগান বিভাগের	কাপ্তাই	(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	১৫৪৬.৮৩
৯	অধিক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজন		(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	১৫০২৭২.১৭

ক্র নং	প্রকল্পের নাম ও বাসআবাসনকাল	প্রকল্প এলাকা ও অর্থায়নের উৎস		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১০	জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন সংরক্ষণসহ অত্যাৱশ্যকীয় অবকাঠামো সংস্কার/উন্নয়ন	বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঢাকা	(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	১৮৮৯.৩২
১১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	কক্সবাজার	(জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	১৮৮৮.২৩
১২	কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেটনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন	কক্সবাজার	(জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	২৩৮১.০০
১৩	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	(জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	৭০০৪.১৫
১৪	মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন	চট্টগ্রাম, মীরসরাই	(জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	১৮৮৮.২৩
১৫	মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকো- পার্কের আধুনিকায়ন প্রকল্প	মাদারীপুর জেলার চরমুগুরিয়া	(জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	৩১৭৩.৮২
১৬	সুন্দরবন পরিবেশবান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	সুন্দরবন	(জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	২৪৯৫.৬০৪
	কারিগরী প্রকল্পঃ			
১৭	ইন্টিগ্রেডিং কমিউনিটি বেইজড এ্যাডাপ্টেশন ইন টু এ্যাফোরেস্টেশন এন্ড রিফোরেস্টেশন পে ইন বাংলাদেশ	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলা; পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা ও রাজাবালি উপজেলা; বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা; ভোলা জেলার মনপুরা, চরফ্যাশন, দৌলতখান ও তমিজদিন উপজেলা; পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া ও মঠবাড়িয়া উপজেলা।	(জুলাই ২০১৬ হতে ২০২১)	৪৫২০.০০

ক্র নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প এলাকা ও অর্থায়নের উৎস		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৮	সমীক্ষা প্রকল্প	বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল	(অক্টোবর ২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২১)	২৩৮১.০০
১৯	ফিজিবিলাটি স্টাডি অব ট্রান্সবান্ডারী ওয়াইল্ডলাইফ করিডোর ইন চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল ট্রান্স এন্ড কক্সবাজার উইথ মায়ানমার এন্ড ইন্ডিয়া	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১)	৩৮১.৩০
২০	পিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এ্যান্ড ফিজিবিলাটি স্টাডি ফর এস্টাবলিশমেন্ট অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, মৌলভীবাজার।	মৌলভীবাজার	(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১)	৪৫০.৬৬
২১	ফিজিবিলাটি স্টাডি ফর ইনস্টলিং এন্ড অপারেটিং ক্যাবল কার এন্ড পিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান ফর মাধবকু- ইকো-পার্ক	সিলেট জেলার মাধবকুন্ড	(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১)	১৬৪.৮১

১০.২ বন অধিদপ্তরে বর্তমানে চলমান জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্পসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত অন্যতম দেশ। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ইতিমধ্যে বন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বর্তমানে ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছেঃ

ছক:১০ বন অধিদপ্তরে বর্তমানে চলমান জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্পসমূহ

ক্রনং	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্প এলাকা	প্রাক্কলিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫
১	জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (খসড়া) সংশোধন ও পরিমার্জন প্রকল্প	সিসিটিএফ	সমগ্র বাংলাদেশ	৩৪৫.০০
২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর বর্ধিতাংশে বায়োডাইভারসিটি পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	সিসিটিএফ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর	২৯৩.০০
৩	কুকুরী-মুকুরী ইকোপার্ক স্থাপন প্রকল্প	সিসিটিএফ	চরফ্যাশন, ভোলা	৪৯৭.৭২
৪	মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সৌর বেটনী স্থাপন	সিসিটিএফ	ঝিনাইগাতী এবং শ্রীবর্ধী উপজেলা, শেরপুর	১০০.০০

ক্রমং	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্প এলাকা	প্রাক্কলিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫
৫	সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ইকোপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প	সিসিটিএফ	কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ	১৪৯৮.৯০
৬	রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিবর্ষন জনিত ভূমিক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা সমূহ মেরামত ও সংস্কার প্রকল্প	সিসিটিএফ	রাঙ্গামাটি সার্কোলাধীন রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	২০০.০০
৭	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন (৩য় পর্যায়)	সিসিটিএফ	সারাদেশব্যাপী	৪৭০.০০
৮	চরফ্যাশন রেঞ্জের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	সিসিটিএফ	চরফ্যাশন, ভোলা	৬০০.০০
৯	খুলনা জেলায় শেখ রাসেল ইকো পার্ক স্থাপন	সিসিটিএফ	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা ও বুপসা উপজেলা।	৮৬৭.০০
১০	সুন্দরবনে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন প্রকল্প	সিসিটিএফ	খুলনা সদর, বাগেরহাট সদর, কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, মোংলা, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ, শ্যামনগর	৩৪৮.০০
১১	সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় সমন্বিত বনায়নের মাধ্যমে যমুনা নদীর চরাঞ্চল ও নাটুয়ার পাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ রক্ষা প্রকল্প	সিসিটিএফ	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলা	২০০.০০
১২	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণ	সিসিটিএফ	সমগ্র বাংলাদেশ	১০০.০০
১৩	টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুকুর খনন ও পুনঃখনন প্রকল্প	সিসিটিএফ	বাগেরহাট সদর, দাকোপ, মোংলা, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ	৪৯৮.৫৪৫

১১. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বন, বন্যপ্রাণী ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রম

বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রোটোকল ও চুক্তিবাংলাদেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কনভেনশন, প্রোটোকল ও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য কনভেনশন, প্রোটোকল ও চুক্তিসমূহ নিম্নরূপঃ

ছক:১১ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বন, বন্যপ্রাণী ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রম

Name	Signed/Ratified or Accessed
Ramsar Convention (Convention on Wetlands of International Importance specially as waterfowl Habitat)	20.4.1992 (Ratified)

UNESCO (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)	03.08.1983 (Accepted), 03.11.1983 (ratified)
UNCCD (United Nations Conventions to Combat Desertification)	14.10.1994 (signed), 26.01.1996 (ratified)
CBD (Convention on Biological Diversity)	05.06.1992 (signed), 20.03.1994 (ratified)
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)	20.11.1981 (signed), 18.02.1982 (Ratified)
CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals)	01.12.2005 (signed)
EAAFP (East Asian Australasian Flyway Partnership)	Bangladesh joined in 2010.
GTI (Global Tiger Initiative)	Established in 2008.
GTF (Global Tiger Forum)	Established in 1994. HQ New Delhi. 1st general assembly held in Dhaka in 2000.
UN REDD Program (Reducing Emission from Deforestation and Forests Degradation)	Started in 2008. Bangladesh joins in 2010.
UNFF (United Nations Forum on Forests)	Establish in 2000.
MFF (Mangrove for the Future)	Bangladesh became member in 2012 in the 9th Regional steering Committee.
APFNet (Asia Pacific Network for Sustainable Forest Management)	Officially launched on 25th September 2008 in Beijing.
SAWEN (South Asia Wildlife Enforcement Network)	Bangladesh joined in 2013.
APAP (Asia Protected Area Partnership)	Bangladesh joined in 2014. To provide technical support for Asia's Protected Areas.

১২. বন জরিপ ও পরিবীক্ষণ (Forest Survey, Forest Inventory and Monitoring)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কারিগরি সহায়তায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক বন জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প ২০১৫-২০১৯ সময়কালে বাস্তবায়ন করা হয়। পূর্বে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন বন অঞ্চল ও বিভিন্ন বন বিভাগের অধিক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে বন জরিপ কার্য পরিচালিত হয়; এ সকল বন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নকশার ভিত্তিতে মূল বন খাতের অংশীজনদের (Main Stakeholders) সাথে মতবিনিময় করে এ বারের বৃক্ষ ও বন এবং আর্থসামাজিক জরিপ পরিচালিত হয়েছে। দেশব্যাপী বৃক্ষ ও বন জরিপ পরিচালনা করার জন্য পাঁচটি জোন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, যা শাল, পাহাড়ী, সুন্দরবন, উপকূলীয় এবং গ্রামীণ জোন হিসেবে দেখানো হয়েছে। সকল জোনের বৃক্ষ ও বন জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।



চিত্র: ৪৮ বন জরিপ ও পরিবীক্ষণ, সুন্দরবন



চিত্র: ৪৯ বন জরিপ ও পরিবীক্ষণ, সুন্দরবন

১২.১ Bangladesh Forest Inventory (BFI)

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in support of REDD+ in Bangladesh প্রকল্পটি ২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে। USAID এর আর্থিক সহযোগিতায় ও FAO এর কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রাপ্ত ফলাফল:

- ১৮৯৮টি নমুনা প্লটের মধ্যে ৩৯০ টি বৃক্ষ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ৯% introduced/exotic species.
- সারা দেশের বন ও বনের বাইরে বৃক্ষ সম্পদের National growing stock- ৩৮৪মিলিয়ন ঘন মিটার;
- National growing stock এর ৬৬% বন এলাকার বাইরে অবস্থিত বৃক্ষ সম্পদ থেকে;
- বৃক্ষের মাটির উপরের অংশে জমাকৃত Biomass এর পরিমাণ ৩৮৭ মিলিয়ন টন;
- প্রধান তিনটি Biomass উৎপাদনকারী বৃক্ষ প্রজাতি- ১। আম ২। সুন্দরি ৩। মেহগনি
- দেশের মাটির উপরের বৃক্ষ সম্পদ, মাটির নিচের বৃক্ষ সম্পদ এবং মাটির মধ্যে (৩০ সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত) সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ ১২৭৬ মিলিয়ন টন।
- ১২৭৬ মিলিয়ন টন কার্বনের প্রায় ২২% বনাঞ্চলের মধ্যে, বাকিটা বন এলাকার বাইরে অবস্থিত;
- ১২৭৬ মিলিয়ন টন কার্বনের প্রায় ১০% পাহাড়ি বনে এবং প্রায় ৫.৫% সুন্দরবনে অবস্থিত;
- দেশের বৃক্ষ সম্পদ Gross National Income (GNI) এর ১.২৯ % অবদান রাখছে;
- সংগৃহীত বৃক্ষ সম্পদ এর অর্থনৈতিক মূল্য ২০১৭-১৮ সালের Gross Domestic Product (GDP) এর ৩.১১%;
- জরিপে তথ্য প্রদানকারী পরিবার সমূহ কমপক্ষে একটি উপকার বৃক্ষ সম্পদ থেকে পেয়েছে;
- বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ সামগ্রী সংগ্রহকারীদের প্রায় ৬৫% মহিলা;
- ৫৪% পরিবার বৃক্ষ ও বন থেকে ঔষধি উপকার পেয়েছে;
- সুন্দরবনের পাশে অবস্থানকারী পরিবার সমূহ অন্যান্য এলাকা থেকে অধিক আয় করে যার অর্ধেকের ও বেশি আসে মাছ ও কাঁকড়া থেকে।

১৩. বন অধিদপ্তরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- বন অধিদপ্তরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন বিভাগ এর তত্ত্বাবধানে একজন উপ প্রধান বন সংরক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ উইংয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১টি বন একাডেমি, ৩টি ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে ও ১টি বন উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। বন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া অত্র উইং বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকেন। অত্র উইং দেশের অভ্যন্তরে বন কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের চাহিদা মোতাবেক বন অধিদপ্তরের কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটে প্রেরণ ও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে। বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের পর কর্মকর্তাগণ লব্ধ জ্ঞান সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল ও বিষয় ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রদান করে থাকেন।
- ফরেস্ট একাডেমি, চট্টগ্রামে সহকারী বন সংরক্ষকদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স (০২ মাস মেয়াদি), ফরেস্ট রেঞ্জার ও ফরেস্টারদের জন্য (০৫ থেকে ১৫ দিন মেয়াদি) ফরেস্ট্রি রিফ্রেশার্স কোর্স, বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রয়োগসহ (০৫ দিনব্যাপী) স্বল্পকালীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট ও রাজশাহীতে ফরেস্টারদের জন্য ০২ বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি (ইন সার্ভিস) প্রশিক্ষণ, বন প্রহরী, বাগান মালী ও মালীদের জন্য আধুনিক নার্সারী ও বাগান সৃজন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই এ বন প্রহরীদের জন্য বেসিক লগিং, বন প্রহরী, বাগান মালী, মালী ও সমপর্যায়ের অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য স্বল্পকালীন আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ০৪ বৎসর (৮টি সেমিস্টার) মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি কোর্সে প্রতিবৎসর ৫০টি আসনের বিপরীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

১১.১ বন্যপ্রাণী শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বন অধিদপ্তর কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত স্ট্রেন্জেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের মাধ্যমে গাজীপুরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি শুব উদ্বোধন করেন। এই সেন্টারের মূল উদ্দেশ্য হলো বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা খাতের সকল পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও আগ্রহী দেশী-বিদেশী ব্যক্তিগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।



চিত্র:৪৯ বন্যপ্রাণী শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ,
শেখ কামাল ওয়াইন্ডলাইফ সেন্টার



চিত্র:৫০ বন্যপ্রাণী শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ,
শেখ কামাল ওয়াইন্ডলাইফ সেন্টার ৫০০ আসন
বিশিষ্ট আধুনিক মিলনায়ত

১৫. REDD+ কার্যক্রমবিশ্বজুড়ে যে পরিমাণ গণহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হয় তার ১১ শতাংশ হয় বন উজাড় (Deforestation) এবং বন অবক্ষয়ের কারণে (forest degradation)। এই প্রেক্ষাপটে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বন উজাড় এবং বন অবক্ষয়ের কারণে যে কার্বন নিঃসরণ হয় তা কমানোর জন্য উৎসাহিত করতে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) এর আওতাভুক্ত দেশগুলো REDD+ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যে সব দেশ এর REDD+ শর্তসমূহ (UNFCCC Warsaw প্রণীত REDD+ কাঠামো) মেনে তাদের কার্বন নিঃসরণের হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে, শুধুমাত্র তারাই যচাইকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা (result based payments) পাবে। এভাবে REDD+ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার পাশাপাশি কিভাবে এ মাত্রা কমিয়ে এনে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব, তার প্রণোদনা যোগাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বনের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিদ্যমান বন সংরক্ষণ করা ও ধ্বংস হওয়া বনাঞ্চলে পুনর্বনায়নের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম শুরুর করছে। আর এজন্যই REDD+ বাস্তবায়নের জন্য ২০১০ সালে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার UN-REDD প্রোগ্রামের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। UN-REDD কর্মসূচি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে REDD+ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে এবং ফলাফল ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য UNFCCC এর প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ যথা ওয়ারশ কাঠামো তৈরিতে সাহায্য করে।



২০১২ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) সহায়তায় বাংলাদেশ বন বিভাগ National REDD+ Readiness Roadmap প্রস্তুত, ও সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় REDD+ Roadmap অনুমোদন করে। ২০১৩ সালে REDD+ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে UN-REDD এর সহায়তায় REDD+ Readiness Preparation Proposal (R-PP) প্রণীত হয় ও এর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে (১) UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি ও (২) Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in Support of REDD+ in Bangladesh (NFI) প্রকল্প দুটি গ্রহণ করা হয়। UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি প্রকল্পটি ১৯শে জুন ২০১৬ তে অনুমোদিত হয়ে ৩০শে জুন ২০১৯ তে শেষ হয়। যক্ষাও প্রকল্পটি ২০১৫ তে অনুমোদিত হয়ে ৩০শে জুন ২০১৯ তে শেষ হয়।

প্রকল্প দুটির সুনির্দিষ্ট অর্জনগুলো হলো: (১) REDD+ পরিচালনা কাঠামো প্রস্তাব, (২) জাতীয় REDD+ কৌশল প্রস্তাব, (৩) বন কার্বন নিঃসরণের মাপকাঠি নির্ণয় (৪) জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন, (৫) National Forest Inventory প্রস্তুত। REDD+ ব্যবস্থাপনা Safeguard Information System)কাঠামো এবং REDD+ জাতীয় কৌশল মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকির আশংকায় REDD+ কার্যক্রমে সুরক্ষা (Safeguard) এবং সুরক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা SIS (Safeguard Information System) পদ্ধতি প্রণয়ন প্রয়োজন। এছাড়া ফলাফল ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য ওয়ারশ কাঠামোর প্রয়োজনীয় শর্তপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক। উল্লেখ্য যে, UNDP এর সাথে LoA (Letter of Agreement) সম্পাদনের মাধ্যমে SIS প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

জাতীয় কৌশল এ বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, অর্থের সংস্থান করতে হবে। কর্মকৌশলটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অর্থনৈতিক, প্রতিবেশগত ও অন্যান্য সুবিধা বয়ে আনবে। REDD+ জাতীয় কৌশলের প্রণয়নের জন্য এ যাবৎ পর্যন্ত যে সকল কৌশলগত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য হলো বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচির আওতায় বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা, জ্বালানী কাঠের যোগান বৃদ্ধির জন্য জ্বালানী বৃদ্ধির রোপণ বৃদ্ধি, বিকল্প জ্বালানী ব্যবস্থা, এসকল বিষয়ে সরকারি প্রণোদনা বৃদ্ধি, উজাড়কৃত অথবা অবক্ষয়িত বনের পুনরায় বনায়ন ইত্যাদি। আশা করা হচ্ছে একসল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু; দারিদ্র হ্রাস, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, ইত্যাদি ইস্যুর উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সর্বোপরি জাতীয় কৌশলের সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধ হবে অন্যদিকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং বায়ুমন্ডল হতে কার্বন অপসারণ বৃদ্ধিপাবে যা বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ভূমিকা রাখবে।

REDD+ জাতীয় কৌশল সরাসরি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, নীতির সাথে সম্পর্কিত যেমন:-বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও অ্যাকশন প্ল্যান (BCCSAP ২০০৯), বন নীতি, ফরেন্স্ট্রি মাস্টার প্ল্যান (খসড়া) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। প্রস্তাবিত এই কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক লক্ষ্য (Nationally Determined Contribution NDC, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-১৫ (Goal 15 : Protect, restore and promote sustainable use terrestrial ecosystem, sustainably manage forest, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss) অর্জনের জন্য সহায়তা করবে।

১৬. সহায়তা এবং সরকারি অনুদানে মোট টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

বন অধিদপ্তর বিশ^ ব্যাংকের ঋণ সহায়তা এবং সরকারি অনুদানের মোট ১৫০,২৭২.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ বছর (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩) মেয়াদে Sustainable Forests & Livelihoods (SUFAL) Project বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। মোট চারটি অঙ্গের আওতায় এ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছেঃ

১ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ।

২ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন।

৩ প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন সম্প্রসারণ এবং বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি।

৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষণ এবং রিপোর্টিং।

প্রকল্পটি বাসআবায়নের মাধ্যমে দেশের সরকারি বন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধিসহ অবক্ষয়িত বনাঞ্চাল পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় বনায়ন, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। অধিকন্তু, বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম ও জীবন-মান উন্নয়নে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা (Collaborative Forest management) কার্যক্রম বাসআবায়ন ও শক্তিশালী করা হবে। ইতোমধ্যে ২০১-২০২০ অর্থ বছরে সংকটাপন্ন ও বিরল দেশীয় প্রজাতির চারা উত্তোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নোক্ত টেবিলে প্রকাশিত হলো।

ছক:১২ ২০২০ সনের বনায়নের অগ্রগতি

বনায়ন	একক	এলাকা	চারার সংখ্যা
বিভিন্ন প্রকার বনায়ন	হেক্টর	১৩,১৭০.০০	২৬৩.৭২
উপকূলীয় বনায়ন	হেক্টর	৪,৪৬০.০০	১৫৮.৪৪
স্ট্রিপ বনায়ন	চারার কিঃ মিঃ	১,৮৪১.০০	১৮.৪১
বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন (মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনে বিতরণের ৩৩.৫ লক্ষ চারা সহ)	সংখ্যা	-	৪৮.৬৯
	মোট		৪৮৯.২৬

উল্লেখ্য যে, প্রকল্পে প্রায় ৮০,০০০ হেক্টর ভূমিতে বিভিন্ন প্রকার বনায়নের মাধ্যমে বন সম্প্রসারণ করার সংস্থান রয়েছে, যার প্রায় ১৮,৯৬০ হেক্টর বনায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। আরও ৮,৫৫০ হেক্টর বনায়নের চারা নার্সারিতে উত্তোলিত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১,২৩৬ জন বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে ৭৭৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ফলে, বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তার/কর্মচারীদের সক্ষমতা সমৃদ্ধ হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে গ্রাম-পর্যায়ে সংগঠিত করে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বন বিট সমূহের সাথে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি বন বিভাগের ৩৩০টি বন বিটের আওতাধীন প্রায় ৬০০টি গ্রামের প্রায় ৮০,০০০ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরী ও কার্যকর করার কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় তাদের বিকল্প জীবিকার সংস্থান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম এর সাথে সাথে প্রতিটি (সহযোগিতামূলক) গ্রাম-সংগঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। ফলে, বনের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি পাবে, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, উপকূলীয় তটরেখা সুরক্ষা পাবে এবং অতি দরিদ্র-বিপদাপন্ন নারী ও পুরুষ নৃ-গোষ্ঠীসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু, অত্র প্রকল্পের আওতায় দেশের ১০টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা (PA Co-Management) পদ্ধতি সম্প্রসারণসহ আরো ১৬টি রক্ষিত এলাকায় বিদ্যমান সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হবে। উল্লেখ্যত কাজ সঠিক ভাবে বাসআবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্পে ৭টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (NGO) সংযুক্তির সংস্থান হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গ্রাম জরীপ, কমিউনিটি প্রোফাইলিং, বিভিন্ন কমিটি গঠন, সংগঠন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, বিকল্প জীবিকার প্রশিক্ষণ প্রদান, মনিটরিং এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হবে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার সফল বাসআবায়নের মাধ্যমে বনভূমি সংলগ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতা কমে আসবে; ফলে, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা পাবে। প্রকল্পের আওতায় সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণেরও বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সফল বাসআবায়ন বাংলাদেশকে বৈশিষ্ট্য টেকসই উন্নয়ন অভিজ্ঞ (Sustainable Development) এর বন আচ্ছাদন বৃদ্ধি, কার্বন সংরক্ষণ, রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সহ বেশকিছু উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করবে।

১৭. বাংলাদেশ ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলোঃ

১ বাংলাদেশের বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনের ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ডলফিনের জন্য ঘোষিত বাংলাদেশের মোট নয়টি রক্ষিত এলাকা হলো:

ছক:১৩ বাংলাদেশ ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

ক্র নং	রক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
১	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	১৭০
২	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৫৬০
৩	টাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৩৪০
৪	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	১৪৬
৫	শিলন্দ-নাগডেমরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	২৪.১৭
৬	নাগরবাড়ি- মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	৪০৮.১১
৭	পানখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৪০৪
৮	ডশবসা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	২১৫৫
৯	ভদ্রা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৮৬৮
মোটঃ			৫০৭৫.২৮

২ ডলফিনের গবেষণার ঘাটতি বিশ্লেষণ এবং আসাবস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩ হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪ সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবহার ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও তার বাসআবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫ পৌচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর অর্থাৎ ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ট্রাফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬ ডলফিন এ্যাকশন প্ল্যান এবং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭ ডলফিন সংরক্ষণের জন্য ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে।

৮ মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারকে “একটি বাড়ি একটি খামার” প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯ ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ডলফিন মেলার আয়োজন সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং কমিউনিটিতে ডলফিন সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম সমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনের ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (টাংমারী, ঘাঘরামারী ও চাঁদপাই) তে এই বৃদ্ধির হার ৫৫%, যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।



চিত্র:৫০ ডলফিন কনজারভেশন প্রশিক্ষণ প্রদান



চিত্র:৫১ ডলফিন কনজারভেশন সচেতনতামূলক কার্যক্রম



চিত্র:৫২ ডলফিন কনজারভেশন প্রশিক্ষণ প্রদান

১৮. সুন্দরবনের বাঘ শুমারীঃ

(USAID) প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্দরবনের ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরুর হয়। ১লা ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল থেকে শুরুর করে ২৪ শে এপ্রিল, ২০১৮ সাল পর্যন্ত চারটি ধাপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা ও শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি ব্লকের ১,৬৫৬ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় বিশেষ এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২২ মে, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। মোট ২৪৯ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের সর্বমোট ২৪৬৬টি ছবি পাওয়া যায়। (SERC) মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। এ হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লক অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শরণখোলা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী (৩.৩৩ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃমিঃ) এবং খুলনা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে কম (১.২১ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃমিঃ)। ২০১৫ সালে সুন্দরবনের ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরুর করা হয়েছিল। সে হিসাব অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব ছিল প্রতি ১০০ বর্গ কিঃমিঃ এ ২.১৭টি এবং মোট বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি।



চিত্র:৫৩ ক্যামোফ্লেজ রং করা ক্যামেরাগুলো
সর্বক্ষণ সচল থাকে। সামনে কোনও নড়াচড়া
ধরা পড়লেই ক্যামেরাটি ছবি তোলে



চিত্র:৫৪ সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের সুপতি
এলাকা তোলা ছবি। চিত্র সৌজন্য: বন্যপ্রাণী
ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা।

১৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলঃ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে বন অধিদপ্তরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে বন অধিদপ্তরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী পূর্বক যথযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন সংরক্ষকের দপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি এবং অংশীজনের মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৈতিকতা কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধামন্ত্র যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের নিকট বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য বন অধিদপ্তরের প্রবেশ মুখে ডিজিটাল ডিসপেন্স এবং দর্শনার্থীদের জন্য আধুনিক মানের অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থাসহ শিশুদের জন্য মানসম্মত বিনোদন সম্বলিত ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। জনগণকে প্রদেয় সেবা সহজীকরণ এবং জনবান্ধব করার জন্য বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ফ্রন্টডেস্ক গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ইনোভেশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী উপকারীভোগীদেরকে অনলাইন চেক প্রদান করা হচ্ছে।

বন অধিদপ্তরসহ এর অওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধামন্ত্র মোতাবেক উত্তোলিত বন বাগানে চারার প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষণ গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উত্তোলিত নার্সারী সৃজিত বাগান পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত নীতিমালার আলোকে বন অধিদপ্তরসহ অওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী ও ভাল কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান হয়েছে।

২০. বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা

বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্য উদ্ভাবন পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর আওতায় বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে “ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের রেস্ট হাউজ সমূহের অনলাইন বুকিং” এ্যাপস তৈরীর কার্যক্রম চলমান আছে। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্য সুন্দরবন পূর্ব ও সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগে বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদ্বয় কর্তৃক সুন্দরবনের ভিতর অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সাটিফিকেট (বিএলসি) প্রদান সহজীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্য সার্ক সংরক্ষণের জন্য সার্কের অবৈধ পাচারের স্থান নির্ণয়ের জন্য তৈরীকৃত এ্যাপস চালু করা হয়েছে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সার্কের অবৈধ পাচার রোধ করে সার্কের সংরক্ষণসহ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২১. বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব ইকোট্যুরিজম ও এর সম্প্রসারণ

বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শয্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার

সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়। বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, মহেশখালী-সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং টেকনাফ পর্যটকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে সামুদ্রিক বিচিত্র রকমের কাছিমসহ কোরাল, কঁকড়া, এবং আরো বিচিত্র রকমের মাছ। কুয়াকাটায় সাগর তীরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সোনার চরের ঝাউবন সমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাড়া ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি পর্যটন স্থানসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রীয় এলাকা: ভাউয়াল ন্যাশনাল পার্ক (গাজীপুর), বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (গাজীপুর), ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (ঢাকা), বলধাগার্ডেন (ঢাকা), মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক (টাঙ্গাইল), মধুটিলা ইকোপার্ক (শেরপুর), রাজেশপুর ইকোপার্ক (কুমিল্লা) ইত্যাদি।

সিলেট এলাকা: রাতারগুল জলাভূমির বন, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, বরশীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, বিহানাকান্দি, হাকালুকী হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড় ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম এলাকা: সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন এন্ড ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (কক্সবাজার), বাঁরৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, শেখ রশেল এ্যাভিনিউ এন্ড ইকোপার্ক, মহামায়া ইকোপার্ক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইত্যাদি।

পার্বত্য এলাকা: কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রাম পাহাড়, সীতা পাহাড়, শুভলং ঝরনা, মাথিনের কুপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিমুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র, শৈল প্রপাত, নীলাচল ইত্যাদি।

উত্তরাঞ্চল: রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক, আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি।

দক্ষিণাঞ্চল: কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, টেংরাগিরি ইকোপার্ক, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক ইত্যাদি।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল: বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কটকা, হিরনপয়েন্ট, দুবলারচর, কচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং করমজল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট। এখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, লোনা পানির কুমির, ডলফিনসহ বিচিত্র রকমের জীবজন্তু।

২১.১ সাফারী পার্ক

চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুসমূহ আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং দর্শনার্থীগণ মুক্ত অবস্থায় থেকে জীবজন্তু পরিদর্শন করেন। কিন্তু সাফারী পার্কে বন্যপ্রাণীসমূহ উন্মুক্ত অবস্থায় বনজঙ্গলে বিচরণ করে এবং মানুষ সতর্কতার সহিত চলমান যানবাহনে আবদ্ধ অবস্থায় জীবজন্তুসমূহ পরিদর্শন করে থাকে।

সাফারী পার্কে দেশী-বিদেশী বন্যপ্রাণীসমূহ ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত অবস্থায় থেকে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পায় এবং উন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে। বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় এবং মহাবিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারী পার্কের ভিতরে (in-situ) এবং বাইরে (ex-situ) মূল আবাসস্থলে সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত ও দলছুট বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা প্রদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সাফারী পার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশে মোট ২টি সাফারী পার্ক রয়েছে। শিক্ষা সফরসহ ভ্রমণ মৌসুমে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী দৃষ্টিভ্রমণ ও প্রাণীবৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এ সাফারী পার্ক সমূহ পরিদর্শন করে থাকে।



চিত্র:৫৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক,
গাজীপুর



চিত্র:৫৬ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক,
গাজীপুর সাদা সিংহ সাফারী

২১.১.১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক বাংলাদেশের প্রথম সাফারী পার্ক। এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকোরিয়া উপজেলার ডুলাহাজরায় অবস্থিত। ১৯৮২ সালে ৪৩.০০ হেক্টর জমির উপর হরিণ প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে ডুলাহাজরা ও হারগজা ব্লকের ৯০০ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক প্রাতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০০-২০০১ অর্থবছর হতে এ সাফারী পার্কের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। সাফারী পার্কটি বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত মননশীল ও সফল পদক্ষেপসমূহের মধ্যে সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্কে বেষ্টনীতে আবদ্ধ বন্যপ্রাণী সমূহ হলো স্তন্যপায়ী ১৩৬টি, পাখি ৯৫টি, সরীসৃপ ৯৭টি ইত্যাদি।



চিত্র:৫৭ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক,
কক্সবাজার

সাফারী পার্ক ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো-

১) প্রকৃতি হতে বিলুপ্ত, অতিবিপন্ন, বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর প্রজনন

২) বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা

৩) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও

৪) পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের সুবিধা বৃদ্ধি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত প্রাণীসমূহের প্রজননে সফলতা পাওয়া গেছে

ছক:১৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত প্রাণীসমূহের প্রজননে সফলতা পাওয়া গেছে

শ্রেণী	প্রজাতির নাম	বাচ্চার সংখ্যা	সংরক্ষণ অবস্থা
স্তন্যপায়ী	কালো ভালুক	৪	অতিবিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট,বি.ডি.-২০১৫)
	রয়েল বেঙ্গল টাইগার	২	অতিবিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট,বি.ডি.-২০১৫)
	সিংহ	৭	বিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন)
	জলহস্তি	৬	বিপদাপন্ন (আই.ইউ.সি.এন)
	উইন্ডি বিট	৫	কম ঝুঁকিপূর্ণ (আই.ইউ.সি.এন)
পাখি	ময়ূর	৫	বাংলাদেশ হতে বিলুপ্ত(আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট,বি.ডি.-২০১৫)
সরীসৃপ	লোনা পানির কুমির	২০	বিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট,বি.ডি.-২০১৫)

সাফারী পার্ক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য একটি আদর্শ গবেষণা ক্ষেত্র। পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণার কাজে অত্র পার্কে আসেন। সারাদেশের স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার একটি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা সফরে আসেন। শিক্ষা সফরে আগত প্রতিটি শিক্ষার্থী দলকে ১জন দক্ষ কর্মকর্তার নেতৃত্বে পার্কে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশ শিক্ষার সুবিধার্থে রয়েছে শিক্ষামূলক ডকুমেন্টারি,তথ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র, বন্যপ্রাণী মিউজিয়াম এবং প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের পাশাপাশি পার্কটিকে দর্শনার্থীদের কাছে আরো আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করার লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী পরামর্শক এর সহযোগিতায় একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান এর আলোকে এবং আধুনিক সাফারী পার্ক তৈরীর ধ্যান ধারণাকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” নামে নতুন একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বহুমুখী সুযোগ-সুবিধাসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টির আশা করা যাচ্ছে।

২১.১.২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

ঢাকা থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘের বাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে সাফারী পার্কটির অবস্থান। ভাওয়াল গড়ের শালবন একসময় জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক প্রাণী ও গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা ও সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের পিরুজালী মৌজার খন্ড খন্ড শাল বনের ৪৯০৯.০ একর বনভূমি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত। এর মধ্যে ৩৬৯০.০ একর এলাকাকে সাফারী পার্কের মাস্টার প্ল্যানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১১ সালে কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৭ সালে শেষ হয়। সাফারী পার্কটি দক্ষিণ এশীয় মডেল বিশেষ করে থাইল্যান্ডের সাফারী ওয়ার্ল্ড (Safari World) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপন করা হয়েছে। সাফারী পার্কের চারদিকে নির্মান করা হয়েছে স্থায়ী ঘেরা এবং উহার মধ্যে দেশী/বিদেশী বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও অবাধ বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে পর্যটকগণ চলমান যানবাহনে অথবা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করতে পারবেন।



চিত্র:৫৮ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক,
গাজীপুর



চিত্র:৫৯ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক,
গাজীপুর

সাফারী পার্কের মূল উদ্দেশ্য

- ১। শাল বনের বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- ২। বাংলাদেশের বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীকে নিজ আবাসস্থলে (in-situ) এবং আবাসস্থলের বাহিরে (ex-situ) সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন;
- ৩। ঢাকা মহানগরীর অতি নিকটে ইকো-ট্যুরিজমের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ৪। শালবনের বন্যপ্রাণী যেমন বানর, মায়া হরিণ, বেজী, বনরুই, বাঘদাস, বন বিড়াল, খরগোশ, শিয়াল, খেকশিয়াল ও অজগরসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা;
- ৫। এছাড়া বাঘ, সিংহ, সাঘার হরিণ, মায়া হরিণ, চিত্রা হরিণ, প্যারা হরিণ এবং অন্যান্য ভূগভোজী বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ৬। গন্ডার, এশীয় হাতী, পারিয়ানী পাখী, জলজ পাখী, কালো ভাল্লুক, মিঠা পানির কুমির, লোনা পানির কুমির, নীল গাই, জলহস্তী ইত্যাদি বিপন্ন ও বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ;
- ৭। আহত ও উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসার নিমিত্তে বন্যপ্রাণীর সেবাশ্রম ও হাসপাতাল স্থাপন;
- ৮। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

ছক:১৫ সাফারী পার্কে দর্শনীয় স্থান ও বেষ্টনী

১। কোর সাফারী পার্ক (Core Safari Park)	১১। তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ্র	২১। ইকো রিসোর্ট
২। বাঘ সাফারী	১২। বুলন্ত সেতু	২২। ক্রাউন ফিজেন্ট পাখিশালা
৩। আফ্রিকান সাফারী	১৩। ম্যাকাউ ল্যান্ড	২৩। ধনেশ পাখিশালা
৪। সাদা সিংহ সাফারী	১৪। 3-D Show	২৪। টিয়া/তোতা পাখিশালা
৫। সিংহ সাফারী	১৫। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার	২৫। কুমির বেষ্টনী
৬। হরিণ সাফারী	১৬। সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা	২৬। পাখি দ্বীপ
৭। প্রজাপতি গার্ডেন	১৭। বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্টোরা	২৭। অর্কিড হাউজ
৮। ফেন্সি কার্প গার্ডেন	১৮। কচ্ছপ ও কাছিম ব্রিডিং সেন্টার	২৮। শকুন পুনর্বাসন কেন্দ্র
৯। ন্যাচারহিস্ট্রি মিউজিয়াম	১৯। লিজার্ড পার্ক	২৯। প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র
১০। ফোয়ারা	২০। ফেন্সি ডার্ক গার্ডেন	৩০। শিশু পার্ক ইত্যাদি

২২ বন অধিদপ্তরের বিশেষ বিশেষ সাফল্য ও অর্জনসমূহের সংক্ষিপ্তসারঃ

- ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৯-২০ আর্থিক সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৭৯,৫৬৪ হেক্টর ব্লক, ২৪,৬৩৩ সিডলিং কি.মি. ষ্ট্রীপ এবং ৫৭,৬৪২ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান করা হয় এবং বিক্রয় বিতরণের ১০ কোটি ৪০ লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়।
- বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ যাবৎ ২ লক্ষ ৫ হাজার ৬৩ জন উপকারভোগীর মাঝে ৩৯৯ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬৯৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের এ যাবৎ রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ৪৬৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৯ হাজার ৪৪৪ টাকা।
- জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃক্ষমেলা ও বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনাসহ নার্সারী থেকে বিক্রয়-বিতরণের মাধ্যমে চারা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সারাদেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ নিরূপণের জন্য বৃক্ষ ও বন জরিপের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর জন্মশত বার্ষিকী তথা মুজিব বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারা দেশে জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে এক কোটি বৃক্ষের চারা বিতরণ ও রোপণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৬ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে গণভবন হতে এই কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ২০,৩২৫টি করে বনজ, ঔষধি ও ফলদ বৃক্ষের চারা জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। বিগত ১৬ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ এর মধ্যে সারা দেশে এক কোটি চারা বিতরণ ও রোপণ কর্মসূচী সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর সার্বিক নির্দেশনায় বন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন মাঠ পর্যায়ে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রোপিত প্রতিটি বৃক্ষের চারা স্মারক বৃক্ষ হিসেবে নিদর্শন হয়ে থাকবে।
- প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২২টি রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় গঠিত কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি এর সদস্য হিসাবে ১৬৯০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন মহিলা সম্পৃক্ত আছে। রক্ষিত এলাকাসমূহের প্রবেশ ফি হতে অর্জিত আয়ের ৫০% স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বরাদ্দ করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হতে গাছ কাটা ০১ জানুয়ারী ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে।
- বন জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, সুন্দরবনের কার্বনমজুদ ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ১০৬ মিলিয়ন টন হতে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৩৯ মিলিয়ন টন এ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সুন্দরবনের মোট কার্বনমজুদের ৩১%। ২০১৬-২০১৯ সালের বৃক্ষজরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে বন ও বৃক্ষের মোট কার্বনমজুদের পরিমাণ ১২৭৬ মিলিয়ন টন।
- বন ও বন্যপ্রাণী সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য ১৪টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, ২টি অ্যাকশন প্ল্যান, ২টি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ও বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে।
- ১টি আইন (২০১২ সন), ১০টি বিধিমালা (১৯৭৩- ২০২০ সন পর্যন্ত) ও ৬ টি নীতিমালা (১৯৯৪-২০১৪ সন পর্যন্ত) অনুমোদিত হয়েছে।
- ১৯৮০ সাল হতে অধ্যাবধি ১৮টি জাতীয় উদ্যান, ২৪টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ৩টি ইকোপার্ক, ১টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এবং ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা ৪৯টি।

- বাংলাদেশের সুন্দরবনসহ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, মৌলভীবাজার; সিলেট বন বিভাগ ও কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) Patrolling প্রবর্তনের মাধ্যমে বন অপরাধ দমন করা হচ্ছে এবং অনলাইন বন্যপ্রাণী অপরাধ ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রধানতঃ সুন্দরবনেই ৭৬,০৯৯ কিলোমিটার এবং অন্যান্য রক্ষিত এলাকায় স্মার্ট টহল পরিচালনা করা হয়েছে। স্মার্ট টহল পরিচালনার পর থেকে সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী হত্যা, পাচার এবং বন অপরাধ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- বাঘ, হাতি ও কুমিরের আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রণীত “বন্যপ্রাণীর আক্রমণে জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা-২০১০” অনুযায়ী নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ১ লক্ষ ও আহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ হাজার করে ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৯৬১ টি জনকে প্রায় ৩,৭১,০৯,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
- উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেটনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ী করণের লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৯-২০ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৫৭,৬৪২ হেক্টর বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- দেশীয় প্রজাতির চারা দিয়ে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি বাগান সৃজনের মাধ্যমে স্থানীয় বন নির্ভরশীল জনগণকে সম্পৃক্ত করে পাহাড়ি, শাল ও উপকূলীয় এলাকায় অংশীদারিত্বমূলক (Collaborative) বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- GIS প্রযুক্তির মাধ্যমে সংগৃহীত বৃক্ষ, বন ও বনজ সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে Bangladesh Forest Inventory (BFI) রিপোর্ট সম্পন্ন করেছে। পাহাড়ি ও শালবন এলাকার বনাঞ্চলে বনায়নযোগ্য এলাকা নিরূপন কল্পে Site Specific Plan প্রস্তুতে web-based module এর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ ও মানচিত্র প্রস্তুতের কাজ করা হচ্ছে।
- বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে উদ্ভাবন পরিকল্পনায় বন অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণ অথবা সেবায় ইনোভেশন বিষয়ে ১) অনলাইনে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বিতরণ ২) বন অধিদপ্তরের নার্সারীর তথ্যাদি সম্পর্কিত এ্যাপস তৈরী এবং ৩) “সুন্দরবনের ভিতরে অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট প্রদান” এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে রেস্ট হাউজসমূহ অন-লাইনে বুকিং” কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- রক্ষিত এলাকায় গ্রান্ট ফাইন্যান্সিং (Grant Financing) প্রক্রিয়ায় পর্যটকদের নিকট হতে আদায়কৃত এন্ট্রি ফি এর ৫০% সংশ্লিষ্ট এলাকার ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ৫৮ লক্ষ টাকার অনুদান ব্যয় করা হয়েছে।

২৩ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

- জাতীয় পুরস্কার প্রদানঃ

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে:

- বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী, চলমান ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে “বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার” প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ডকে মোট ১০টি শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিটি শ্রেণির পুরস্কার প্রাপ্তদের সনদসহ অর্থ প্রদান করা হয়। প্রথম স্থান অধিকারীকে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ২০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

- বঙ্গাবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার

জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/ সংস্থাকে সম্মানিত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে “Bangabandhu Award for Wildlife Conservation” পদক প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জাতীয় এই পদক প্রদানের বিষয়টিকে আরও জোরদার করার অভিপ্রায়ে ২০১২ সালে “Bangabandhu Award for Wildlife Conservation” নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।

সরকার ২০১০ সাল থেকে মূলতঃ বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অবদান, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কার্যক্রম, মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে বিশেষ অবদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান- এই বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার প্রদান করে আসছে। প্রতি বছর প্রত্যেক ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে একটি ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণ পদক, সনদপত্র ও ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার গ্রহণঃ বন সংরক্ষণ ও সহ ব্যবস্থাপনায় বন বিভাগের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ নিম্নবর্ণিত আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জিত হয়ঃ

- UN declared Equator Award 2012
- Wangiri Mathai Award 2012
- JSW Earth Care Award 2012
- Solution Search 2013
- HSBC-Daily Star Climate Award
- People's Choice Award (The Conservance & RARE, USA)
- Champion of the earth 2015

২৪ বন অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা

- বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) হালনাগাদ না হওয়ায় যুগোপযোগী বন ব্যবস্থাপনা ব্যহত হচ্ছে।
- বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, বনায়ন, টহল, আবাসন সংকট, প্রয়োজনীয় উপকরণ (Logistics) ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বাজেটের অপ্রতুলতা।
- বন সংরক্ষণ ব্যতিত বনভূমির ভিন্ন ব্যবহার।
- সংরক্ষিত বনের (Reserved Forests) জরিপসহ সীমানা চিহ্নিতকরণে প্রতিবন্ধকতা।
- বনভূমির জবরদখল।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ধ্বংস ও অবৈজ্ঞানিক ভূমি ব্যবহারহেতু Watershed বিপর্যস্ত।
- বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে রক্ষিত এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণে প্রতিবন্ধকতা।
- প্রথাগত বুম চাষ (Shifting Cultivation) এর কারণে পার্বত্য ভূমি (বনভূমিসহ) এর ভূমি ক্ষয়ের পাশাপাশি অনুর্বরতা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বৃটিশ আমলের পরবর্তী সময়ে রাজ্যমাটি পার্বত্য অঞ্চলের ঘোষিত সংরক্ষিত বনে বনায়ন এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় গোষ্ঠী বিশেষের অসহযোগিতা।
- বন্যপ্রাণীর অবৈধ পাচার ও বানিজ্য।
- জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বন সৃজন, বনভূমি পুনরুদ্ধার ও বন সংরক্ষণে বিনিয়োগের অপ্রতুলতা।
- বন অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা।
- রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের কারনে বন ধ্বংস, ভূমির অবক্ষয় ও প্রতিবেশ বিপর্যয়।

২৫ বন অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের সুপারিশসমূহ

- বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) দ্রুততম সময়ের মধ্যে হালনাগাদ করতঃ যুগোপযোগী বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- বন জরিপ ও সীমানা নির্ধারণ করা।
- বনভূমি বনায়ন ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহার বন্ধ করা।
- বনভূমির জবরদখল প্রতিরোধ ও উচ্ছেদের জন্য আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- সকল ক্ষেত্রে বন সংরক্ষণকে টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
- বনভূমির ক্ষয়রোধ সহায়ক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম বিজ্ঞান সম্মতভাবে বাস্তবায়ন করা।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বন ব্যবস্থাপনায় আরও বেশী সম্পৃক্ত করা।
- বুম চাষ (Shifting Cultivation) পদ্ধতিকে আধুনিকায়নের জন্য পার্বত্য ভূমিতে Across the contour পদ্ধতির পরিবর্তে Along the contour পদ্ধতিতে বুম চাষ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বুম চাষের (Shifting Cultivation) ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় Fallow Period (পতিত সময়কাল) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পৃক্ততায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বন সংরক্ষণ ও বন সৃজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার ও রাজনৈতিক প্রত্যয় অর্জন করা।
- প্রথাগত বুম চাষ পদ্ধতিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে পার্বত্য ভূমির ক্ষয়রোধ, নদী ও ছড়া ভরাট রোধ করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমির যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করে watershed ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সাধন করার জন্য অবক্ষয়িত বনভূমিকে দ্রুত বনায়নের আওতায় আনা।
- উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টিত তৈরী করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বন সৃজন, বন পুনরুদ্ধার ও বন সংরক্ষন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বনের অবক্ষয় (Forest Degradation) প্রশমন ও বনখাতে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বন সৃজন, বনভূমি পুনরুদ্ধার ও বন সংরক্ষনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
- রক্ষিত এলাকা (Protected Area) সম্প্রসারণ করা।
- বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, টহল এবং বনায়নের জন্য প্রয়োজনানুসারে যৌক্তিক পরিমানে লজিস্টিকস ও বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করাসহ অবৈধ বানিজ্য ও পাচার রোধ করা।
- প্রকৃতি পর্যটনের মাধ্যমে বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- প্রতিবেশ সেবার মূল্য নিরূপণ করা এবং প্রতিবেশ সেবার উপর ভিত্তি করে বন ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ করা।
- বন অধিদপ্তরের বিদ্যমান অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পন্ন করা।
- বনভূমি ও বনাঞ্চলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত পানিপথ, নদী-নালা, ছড়া, ঝিরি ইত্যাদির গতিপথ ও নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সুনীল অর্থনীতিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে সামুদ্রিক রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জন করা।
- রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যার কারনে বন ধ্বংস ও ভূমির অবক্ষয় রোধ করা।

(মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী)

প্রধান বন সংরক্ষক

বন অধিদপ্তর

বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের সাফল্যের কিছু চিত্র:



চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে উদ্ধারকৃত ছয় শতাধিক পাখি



গ্রীনভিউ রিসোর্ট, মৈনারটেক, উত্তরখান, ঢাকা থেকে উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর ট্রফি



আজমপুর বাজার, উত্তরা থেকে উদ্ধারকৃত ৪৫ টি কানিবক



শাহবাগের পরীবাগ থেকে উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর ২৮৮ টি ট্রফি



সাভার, ইটখোলা, আশুলিয়া থেকে উদ্ধারকৃত ৭১০ টি বন্যপ্রাণী

কিশোরগঞ্জ সদর ও ভৈরব বাজার থেকে উদ্ধারকৃত ৯৬ টি বন্যপ্রাণী





পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে মতবিনিময় সভা



পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ



রাজশাহীর জবইবিলের পাখি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মতবিনিময় সভা



আত্রাই নদীর পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে মতবিনিময় সভা



পরিয়ায়ী পাখি সংরক্ষণে আলোচনা সভা



বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা



বিশ্ব ডলফিন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা



পরিয়ায়ী পাখি সংরক্ষণে আলোচনা সভা



বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুন্দরবনের বাঘ শুমারী



সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের সুপতি এলাকা থেকে ২০১৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর তোলা ছবি। চিত্র সৌজন্য: বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা।



ক্যামোফ্লেজ রং করা ক্যামেরাগুলো সর্বক্ষণ সচল থাকে। সামনে কোনও নড়াচড়া ধরা পড়লেই ক্যামেরাটি ছবি তোলে



বিভিন্ন এলাকায় বাঘের অসংখ্য পায়ের ছাপ পড়ে আছে



বন অধিদপ্তরের বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ





